শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছোটদের

মেজদিদি

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ঃ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

মেজদিদি

এক

কেষ্টার মা মুড়ি-কড়াই ভাজিয়া, চাহিয়া-চিন্তিয়া, অনেক দুঃখে কেষ্টধনকে চোদ্দ বছরেরটি করিয়া মারা গেলে, গ্রামে তাহার আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। বৈমাত্র বড় বোন কাদম্বিনীর অবস্থা ভাল। সবাই কহিল, যা কেষ্ট, তোর দিদির বাড়িতে গিয়ে থাক গে। সে বড়মানুষ, বেশ থাকবি যা।

মায়ের দুঃখে কেষ্ট কাঁদিয়া-কাটিয়া জ্বর করিয়া ফেলিল। শেষে ভাল হইয়া, ভিক্ষা করিয়া শ্রাদ্ধ করিল। তার পরে ন্যাড়া মাথায় একটি ছোট পুঁটুলি সম্বল করিয়া, দিদির বাড়ি রাজহাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। দিদি তাহাকে চিনিত না। পরিচয় পাইয়া এবং আগমনের হেতু শুনিয়া একেবারে অগ্নিমূর্তি হইয়া উঠিল। সে নিজের নিয়মে ছেলেপুলে লইয়া ঘরসংসার পাতিয়া বসিয়াছিল—অকস্মাৎ এ কি উৎপাত!

পাড়ার যে বুড়ামানুষটি কেষ্টাকে পথ চিনাইয়া সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহাকে কাদম্বিনী খুব কড়া কড়া দু'চার কথা শুনাইয়া দিয়া কহিল, ভারী আমার মাসীমার কুটুমকে ডেকে এনেছেন, ভাত মারতে ! সৎমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, জ্যান্তে একদিন খোঁজ নিলে না, এখন মরে গিয়ে ছেলে পাঠিয়ে তত্ত্ব করেছেন। যাও বাপু, তুমি পরের ছেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাও—এ-সব ঝঞ্ঝাট আমি পোয়াতে পারব না।

বুড়া জাতিতে নাপিত। কেষ্টার মাকে ভক্তি করিত, মা-ঠাকরুন বলিয়া ডাকিত। তাই এত কটূক্তিতেও হাল ছাড়িল না। কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিল, দিদিঠাকরুন, লক্ষ্মীর ভাঁড়ার তোমার। কত দাস-দাসী, অতিথ-ফকির, কুকুর-বেড়াল এ সংসারে পাত পেতে মানুষ হয়ে যাচ্ছে, এ ছোঁড়া দু'মুঠো খেয়ে বাইরে পড়ে থাকলে তুমি জানতেও পারবে না। বড় শান্ত সুবোধ ছেলে দিদিঠাকরুন ! ভাই বলে না নাও, দুঃখী অনাথ বামুনের ছেলে বলেও বাড়ির কোণে একটু ঠাঁই দাও দিদি।

এ স্তুতিতে পুলিশের দারোগার মন ভেজে, কাদম্বিনী মেয়েমানুষ মাত্র। কাজেই সে তখনকার মত চুপ করিয়া রহিল। বুড়া কেষ্টকে আড়ালে ডাকিয়া দুটা শলা-পরামর্শ দিয়া চোখ মুছিয়া বিদায় লইল। কেষ্ট আশ্রয় পাইল।

কাদম্বিনীর স্বামী নবীন মুখুজ্যের ধান-চালের আড়ত ছিল। তিনি বেলা বারোটার পর বাড়ি ফিরিয়া কেষ্টাকে বক্র কটাক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, এটি কে ?

কাদম্বিনী মুখ ভারী করিয়া জবাব দিল, তোমার বড়কুটুম গো, বড়কুটুম ! নাও, খাওয়াও, পরাও, মানুষ কর—পরকালের কাজ হোক।

নবীন সৎ-শাশুড়ীর মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াছিলেন, ব্যাপারটা বুঝিলেন ; কহিলেন, বটে ! বেশ নধর গোলগাল দেহটি ত !

স্ত্রী কহিলেন, বেশ হবে না কেন ? বাপ আমার বিষয়-আশয় যা-কিছু রেখে গিয়েছিলেন, সে সমস্তই সৎমা ওর গব্‌ভরে ঢুকিয়েছে। আমি ত তার একটি কানাকড়িও পেলুম না।

বলা বাহুল্য, এই বিষয়-আশয় একখানি মাটির ঘর এবং তৎসংলগ্ন একটি বাতাবি নেবুর গাছ। ঘরটিতে বিধবা মাথা গুঁজিয়া থাকিতেন এবং নেবুগুলি বিক্রি করিয়া ছেলের ইস্কুলের মাহিনা যোগাইতেন।

নবীন রোষ চাপিয়া বলিলেন, খুব ভাল।

কাদম্বিনী কহিলেন, ভাল নয় আবার ! বড়কুটুম যে গো ! তাঁকে তার মত রাখতে হবে ত ! এতে আমার পাঁচুগোপালের বরাতে এক-বেলা এক-সন্ধ্যা জোটে ত তাই ঢের ! নইলে অখ্যাতিতে দেশ ভরে যাবে। বলিয়া পাশের বাড়ির দোতলা ঘরের বিশেষ একটা খোলা জানালার প্রতি রোষকষায়িত লোচনের অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এই ঘরটি তার মেজজা হেমাঙ্গিনীর।

কেষ্ট বারান্দার একধারে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। কাদম্বিনী ভাঁড়ারে ঢুকিয়া একটা নারিকেল মালায় একটুখানি তেল আনিয়া, তাহার পাশে ধরিয়া দিয়া কহিলেন, আর মায়াকান্না কাঁদতে হবে না, যাও, পুকুর থেকে ডুব দিয়ে এস গে—বলি, ফুলেল তেল-টেল মাখা অভ্যাস নেই ত ? স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া চেঁচাইয়া বলিলেন, তুমি চান করতে যাবার সময় বাবুকে ডেকে নিয়ে যেয়ো গো, নইলে ডুবে মলে-টলে বাড়িসুদ্ধ লোকের হাতে দড়ি পড়বে।

কেষ্ট ভাত খাইতে বসিয়াছিল। সে স্বভাবতঃই ভাতটা কিছু বেশী খাইত। তাহাতে কাল বিকাল হইতে খাওয়া হয় নাই, আজ এতখানি পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে—বেলাও হইয়াছে। নানা কারণে পাতের ভাতগুলি নিঃশেষ করিয়াও তাহার ঠিক ক্ষুধা মিটে নাই। নবীন অদূরে খাইতে বসিয়াছিলেন ; লক্ষ্য করিয়া স্ত্রীকে কহিলেন, কেষ্টকে আর দুটি ভাত দাও গো—

দিই, বলিয়া কাদম্বিনী উঠিয়া গিয়া পরিপূর্ণ একথালা ভাত আনিয়া সমস্তটা তাহার পাতে ঢালিয়া দিয়া, উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, তবেই হয়েছে ! এ হাতির খোরাক নিত্য যোগাতে গেলে যে আমাদের আড়ত খালি হয়ে যাবে ! ওবেলা দোকান থেকে মণ-দুই মোটা চাল পাঠিয়ে দিয়ো, নইলে দেউলে হতে দেরি হবে না, তা বলে রাখছি।

মর্মান্তিক লজ্জায় কেষ্টর মুখখানি আরও ঝুঁকিয়া পড়িল। সে এক মায়ের এক ছেলে। দুঃখিনী জননীর কাছে সরু চাল খাইতে পাইয়াছিল কিনা, সে খবর জানি না, কিন্তু পেট ভরিয়া খাওয়ার অপরাধে কোনদিন

লজ্জায় মাথা হেঁট করিতে হয় না, তাহা জানি। তাহার মনে পড়িল, হাজার বেশী খাইয়াও কখন মায়ের মনের সাধ মিটাইতে পারে নাই। মনে পড়িল, এই সেদিনও ঘুড়ি-লাটাই কিনিবার জন্য দু'মুঠা ভাত বেশী খাইয়া পয়সা আদায় করিয়া লইয়াছিল।

তাহার দুই চোখের কোণ বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ভাতের থালার উপর নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, সে সেই ভাত মাথা গুজিয়া গিলিতে লাগিল,—বাঁ-হাতটা তুলিয়া মুছিতে পর্যন্ত সাহস করিল না, পাছে দিদির চোখে পড়ে। অনতিপূর্বেই মায়াকান্না কাঁদার অপরাধে বকুনি খাইয়াছিল। সেই ধমক তাহার এতবড় মাতৃ-শোকেরও ঘাড় চাপিয়া রাখিল।

দুই

পৈতৃক বাড়িটা দুই ভায়ে ভাগ করিয়া লইয়াছিল।

পাশের দোতলা বাড়িটা মেজভাই বিপিনের। ছোটভায়ের অনেকদিন মৃত্যু হইয়াছিল। বিপিনেরও ধান-চালের কারবার। তাহার অবস্থাও ভাল, কিন্তু বড়ভাই নবীনের সমান নয়। তথাপি ইহার বাড়িটাই দোতলা। মেজবৌ হেমাঙ্গিনী শহরের মেয়ে। সে দাসদাসী রাখিয়া, লোকজন খাওয়াইয়া, জাঁকজমকে থাকিতে ভালবাসে। পয়সা বাঁচাইয়া গরিবী চালে চলে না বলিয়াই বছর-চারেক পূর্বে দুই জায়ে কলহ করিয়া পৃথক হইয়াছিল। সেই অবধি প্রকাশ্য কলহ অনেকবার হইয়াছে, অনেকবার মিটিয়াছে, কিন্তু মনোমালিন্য একটি দিনের জন্যও ঘুচে নাই। কারণ, সেটা বড়জা কাদম্বিনীর একলার হাতে। তিনি পাকা লোক, ঠিক বুঝিতেন, ভাঙ্গা হাঁড়ি জোড়া লাগে না। কিন্তু মেজবৌ অত পাকা নয়, অমন করিয়া বুঝিতেও পারিত না। ঝগড়াটা প্রথমে সেই করিয়া ফেলিত বটে, কিন্তু সেই মিটাইবার জন্য, কথা কহিবার জন্য, খাওয়াইবার জন্য ভিতরে ভিতরে ছটফট করিয়া একদিন আস্তে আস্তে কাছে আসিয়া বসিত। শেষে, হাতে-পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া, ঘাট মানিয়া, বড়-জাকে নিজের ঘরে ধরিয়া আনিয়া ভাব করিত। এমনই করিয়া দুই জায়ের অনেকদিন কাটিয়াছে। আজ বেলা তিনটা সাড়ে-তিনটার সময় হেমাঙ্গিনী এ বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কূপের পার্শ্বে সিমেন্ট-বাঁধান বেদীর উপর রোদে বসিয়া কেষ্ট সাবান দিয়া একরাশ কাপড় পরিষ্কার করিতেছিল, কাদম্বিনী দূরে দাঁড়াইয়া, অল্প সাবান ও অধিক গায়ের জোরে কাপড় কাচিবার কৌশলটা শিখাইয়া দিতেছিলেন। মেজজাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, মাগো—ছোঁড়াটা কি নোংরা কাপড়-চোপড় নিয়েই এসেচে!

কথাটা সত্য। কেষ্টার সেই লাল-পেড়ে ধুতিটা পরিয়া এবং চাদরটা গায়ে দিয়া কেহ কুটুমবাড়ি যায় না। দুটোকে পরিষ্কার করার আবশ্যক ছিল বটে, কিন্তু রজকের অভাবে ঢের বেশী আবশ্যক হইয়াছিল পুত্র পাঁচুগোপালের জোড়া-দুই এবং তাহার পিতার জোড়া-দুই পরিষ্কার করার। কেষ্টা আপাততঃ তাহাই করিতেছিল। হেমাঙ্গিনী চাহিয়াই টের পাইল বস্ত্রগুলি কাহাদের। কিন্তু সে উল্লেখ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ছেলেটি কে দিদি? ইতিপূর্বে নিজের ঘরে বসিয়া আড়ি পাতিয়া সে সমস্তই অবগত হইয়াছিল। দিদি ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, দিব্যি ছেলেটি ত! মুখের ভাব তোমার মতই দিদি। বলি, বাপের বাড়ির কেউ না কি?

কাদম্বিনী বিরক্ত-মুখে জবাব দিলেন, হুঁ, আমার বৈমাত্র ভাই। ওরে, ও কেষ্ট, তোর মেজদিদিকে একটা প্রণাম কর্ না রে! কি অসভ্য ছেলে বাবা! গুরুজনকে একটা নমস্কার করতে হয়, তাও কি তোর মা শিখিয়ে দিয়ে মরেনি রে?

কেষ্ট থতমত খাইয়া উঠিয়া আসিয়া কাদম্বিনীর পায়ের কাছেই নমস্কার করাতে তিনি ধমকাইয়া উঠিলেন, আ মর, হাবা কালা নাকি! কাকে প্রণাম করতে বললুম, কাকে এসে করলে!

বস্তুতঃ, আসিয়া অবধি তিরস্কার ও অপমানের অবিশ্রাম আঘাতে তাহার মাথা বে-ঠিক হইয়া গিয়াছিল। তাহার ঝাঁজে ব্যস্ত ও হতবুদ্ধি হইয়া হেমাঙ্গিনীর পায়ের কাছে সরিয়া আসিয়া শির অবনত করিতেই সে হাত দিয়া ধরিয়া ফেলিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ করিল—থাক থাক, হয়েছে ভাই—চিরজীবী হও! কেষ্ট মূঢ়ের মত তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। এ দেশে এমন করিয়া যে কেহ কথা বলিতে পারে, ইহা যেন তাহার মাথায় ঢুকিল না।

তাহার সেই কুণ্ঠিত ভীত অসহায় মুখখানির পানে চাহিবামাত্রেই হেমাঙ্গিনীর বুকের ভিতরটা যেন মুচড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল। নিজেকে আর সামলাইতে না পারিয়া, সহসা এই হতভাগ্য অনাথ বালককে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া, তাহার পরিশ্রান্ত ঘর্মাপ্লুত মুখখানি নিজের আঁচলে মুছাইয়া দিয়া জা'কে কহিল, আহা, একে দিয়ে কি কাপড় কাচিয়ে নিতে আছে দিদি, একটা চাকর ডাকনি কেন ?

কাদম্বিনী হঠাৎ অবাক হইয়া গিয়া জবাব দিতে পারিলেন না ; কিন্তু নিমেষে সামলাইয়া লইয়া রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, আমি ত তোমার মত বড়মানুষ নই মেজবৌ যে, বাড়িতে দশ-বিশটা দাসদাসী আছে ? আমাদের গেরস্ত-ঘরে—

কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই হেমাঙ্গিনী নিজের ঘরের দিকে মুখ তুলিয়া মেয়েকে ডাকিয়া কহিল, উমা, শিবুকে একবার এ-বাড়িতে পাঠিয়ে দে ত মা, বঠ্‌ঠাকুর আর পাঁচুর ময়লা কাপড়গুলো পুকুর থেকে কেচে শুকোতে দিক। বড় জা'য়ের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, এ বেলা কেষ্ট আর পাঁচুগোপাল আমার ওখানে খাবে দিদি। সে ইস্কুল থেকে এলেই পাঠিয়ে দিয়ো, আমি ততক্ষণে একে নিয়ে যাই। কেষ্টকে কহিল, ওঁর মত আমিও তোমার দিদি হই কেষ্ট—এসো আমার সঙ্গে। বলিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া নিজেদের বাড়ি চলিয়া গেল।

কাদম্বিনী বাধা দিলেন না। অধিকন্তু হেমাঙ্গিনী-প্রদত্ত এত বড় খোঁচাটাও নিঃশব্দে হজম করিলেন। তাহার কারণ, যে ব্যক্তি খোঁচা দিয়াছে, সে এ-বেলা খরচটাও বাঁচাইয়া দিয়াছে। কাদম্বিনীর পয়সার বড় সংসারে আর কিছু ছিল না। তাই, গাভী দুধ দিতে দাঁড়াইয়া পা ছুড়িলে তিনি সহিতে পারিতেন।

তিন

সন্ধ্যার সময় কাদম্বিনী প্রশ্ন করিলেন, কি খেয়ে এলি রে কেষ্ট ?

কেষ্ট সলজ্জ নতমুখে কহিল, লুচি।

কি দিয়ে খেলি ?

কেষ্ট তেমনিভাবে বলিল; রুইমাছের মুড়োর তরকারি, সন্দেশ, রসগো—

ইস্‌! বলি মেজ-ঠাকরুন মুড়োটা কার পাতে দিলেন ?

হঠাৎ এই প্রশ্নে কেষ্টর মুখখানি পাণ্ডুর হইয়া গেল। উদ্যত প্রহরণের সম্মুখে রজ্জুবদ্ধ জানোয়ারের প্রাণটা যেমন করিয়া উঠে, কেষ্টর বুকের ভিতরটায় তেমনিধারা করিতে লাগিল। দেরি দেখিয়া কাদম্বিনী কহিলেন, তোর পাতে বুঝি ?

গুরুতর অপরাধীর মত কেষ্ট মাথা হেঁট করিল।

অদূরে দাওয়ায় বসিয়া নবীন তামাক খাইতেছিলেন। কাদম্বিনী সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বলি, শুনলে ত ?

নবীন সংক্ষেপে হুঁ বলিয়া হুঁকায় টান দিলেন।

কাদম্বিনী উষ্মার সহিত বলিতে লাগিলেন, খুড়ী আপনার লোক, ব্যবহারটা দেখ! পাঁচুগোপাল আমার রুইমাছের মুড়ো বলতে অজ্ঞান, সে কি তা জানে না ? তবে কোন আক্কেলে তার পাতে না দিয়ে বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়ে দিলে ? বলি হাঁরে কেষ্ট, সন্দেশ-রসগোল্লা খুব পেট-ভরে খেলি ? সাতজন্মে কখন তুই এ-সব চোখেও দেখিস নি। স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, যারা দুটি ভাত পেলে বেঁচে যায়, তাদের পেটে লুচি-সন্দেশ কি হবে! কিন্তু, আমি বলচি তোমাকে, কেষ্টকে মেজগিন্নী বিগড়ে না দেয় ত আমাকে কুকুর ব'লে ডেকো।

নবীন মৌন হইয়া রহিলেন। কারণ স্ত্রী বিদ্যমানে মেজবৌ তাহাকে বিগড়াইয়া ফেলিতে পারিবে, এরূপ দুর্ঘটনা তিনি বিশ্বাস করিলেন না। তাঁহার স্ত্রীর কিন্তু স্বামীর উপরে বিশ্বাস ছিল না বরং ষোল আনা ভয় ছিল, সাদাসিধা ভালোমানুষ বলিয়া যে-কেহ তাঁহাকে ঠকাইয়া লইতে পারে। সেইজন্য ছোটভাই কেষ্টর মানসিক উন্নতি-অবনতির প্রতি সেই অবধি তিনি প্রখর দৃষ্টি পাতিয়া রাখিলেন।

পরদিন হইতেই দুটো চাকরের একটাকে ছাড়ান হইল, কেষ্ট নবীনের ধান-চালের আড়তে কাজ করিতে লাগিল। সেখানে সে ওজন করে, বিক্রি করে, চার-পাঁচ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া নমুনা সংগ্রহ করিয়া আনে,

দুপুরবেলা নবীন ভাত খাইতে আসিলে দোকান আগলায়। দিন-দুই পরে একদিন তিনি আহার-নিদ্রা সমাপ্ত করিয়া ফিরিয়া গেলে; সে ভাত খাইতে আসিয়াছিল। তখন বেলা তিনটা। কেষ্ট পুকুর হইতে স্নান করিয়া আসিয়া দেখিল, দিদি ঘুমাইতেছেন। তাহার তখনকার ক্ষুধার তাড়নায় বোধ করি বাঘের মুখ হইতেও খাবার কাড়িয়া আনিতে পারিত, কিন্তু দিদিকে ডাকিয়া তুলিবে, এ সাহস হইল না।

রান্নাঘরের দাওয়ার একধারে চুপটি করিয়া দিদির ঘুমভাঙ্গার আশায় বসিয়াছিল, হঠাৎ ডাক শুনিল—কেষ্ট ?

সে আহ্বান কি স্নিগ্ধ হইয়াই তাহার কানে বাজিল। মুখ তুলিয়া দেখিল, মেজদি তাঁহার দোতলার ঘরের জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কেষ্ট একটিবার চাহিয়াই মুখ নামাইল। খানিক পরে হেমাঙ্গিনী নামিয়া আসিয়া, সুমুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ক'দিন দেখিনি ত ? এখানে চুপ করে বসে কেন, কেষ্ট ?

একে ক্ষুধায় অল্পেই চোখে জল আসে, তাহাতে এমন স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বর ! তাহার দু'চোখ টলটল করিতে লাগিল। সে ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল, উত্তর দিতে পারিল না।

মেজখুড়ীমাকে সব ছেলেমেয়েরা ভালবাসিত। তাঁহার গলার স্বর শুনিয়া কাদম্বিনীর ছোটমেয়ে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া চেঁচাইয়া বলিল, কেষ্টমামা, রান্নাঘরে তোমার ভাত ঢাকা আছে, খাও গে, মা খেয়েদেয়ে ঘুমোচ্ছে।

হেমাঙ্গিনী অবাক হইয়া কহিলেন, কেষ্টর এখনও খাওয়া হয়নি, তোর মা খেয়ে ঘুমোচ্চে কি রে—হাঁ কেষ্ট, আজ এত বেলা হল কেন?

কেষ্ট ঘাড় হেঁট করিয়াই রহিল। টুনি তাহার হইয়া জবাব দিল, কেষ্টমামার রোজ ত এমনি বেলাই হয়। বাবা খেয়ে দেয়ে দোকানে ফিরে গেলে তবে ত ও খেতে আসে।

হেমাঙ্গিনী বুঝিলেন, কেষ্টকে দোকানের কাজে লাগান হইয়াছে। তাহাকে বসাইয়া খাওয়ান হইবে, এ আশা অবশ্য তিনি করেন নাই; কিন্তু একবার এই বেলার দিকে চাহিয়া, একবার এই ক্ষুধা ও তৃষ্ণার আর্ত শিশুদেহের পানে চাহিয়া, তাঁহার চোখে জল পড়িতে লাগিল। আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে তিনি বাড়ি চলিয়া গেলেন। মিনিট-দুই পরে একবাটি দুধ হাতে ফিরিয়া আসিয়া, রান্নাঘরে ঢুকিয়াই শিহরিয়া মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

কেষ্ট খাইতে বসিয়াছিল। একটা পিতলের থালার উপর ঠাণ্ডা শুকনা ড্যালাপাকান ভাত। একপাশে একটুখানি ডাল ও কি একটু তরকারির মত। দুধটুকু পাইয়া তাহার মলিন মুখখানি হাসিতে ভরিয়া গেল।

হেমাঙ্গিনী দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কেষ্ট খাওয়া শেষ করিয়া পুকুরে আঁচাইতে চলিয়া গেলে একটিবার মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, পাতে গোনা একটিও ভাত পড়িয়া নাই। ক্ষুধার জ্বালায় সে সেই অন্ন নিঃশেষ করিয়া খাইয়াছে।

হেমাঙ্গিনীর ছেলে ললিতও প্রায় সেই বয়সী। নিজের অবর্তমানে নিজের ছেলেকে এই অবস্থায় হঠাৎ কল্পনা করিয়া ফেলিয়া কান্নার ঢেউ তাঁহার কণ্ঠে পর্যন্ত ফেনাইয়া উঠিল। তিনি সেই কান্না চাপিতে চাপিতে বাড়ি চলিয়া গেলেন।

চার

সর্দি উপলক্ষ করিয়া হেমাঙ্গিনীর মাঝে মাঝে জ্বর হইত, দিন-দুই থাকিয়া আপনি ভাল হইয়া যাইত। দিন-কয়েক পরে এমনি একটু জ্বর বোধ হওয়ায় সন্ধ্যার পর বিছানায় পড়িয়া ছিলেন। ঘরে কেহ নাই, হঠাৎ মনে হইল, কে যেন অতি সন্তর্পণে কবাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। ডাকিলেন, কে রে ওখানে দাঁড়িয়ে, ললিত?

কেহ সাড়া দিল না। আবার ডাকিতে, আড়াল হইতে জবাব আসিল, আমি।

কে আমি রে? আয়, ঘরে এসে ব'স।

কেষ্ট সসঙ্কোচে ঘরে ঢুকিয়া দেয়াল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। হেমাঙ্গিনী উঠিয়া বসিয়া সস্নেহে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন রে কেষ্ট?

কেষ্ট আরও একটু সরিয়া আসিয়া, মলিন কোঁচার খুঁট খুলিয়া দুটি আধ-পাকা পেয়ারা বাহির করিয়া বলিল, জ্বরের উপর খেতে বেশ।

হেমাঙ্গিনী সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া বলিলেন, কোথায় পেলি রে? আমি কাল থেকে লোকের কত খোশামোদ করছি, কেউ এনে দিতে পারে নি, বলিয়া পেয়ারাসুদ্ধ কেষ্টর হাতখানি ধরিয়া কাছে বসাইলেন। কেষ্ট লজ্জায় আহ্লাদে আরক্ত মুখ হেঁট করিল। যদিও, এটা পেয়ারার সময় নয়, হেমাঙ্গিনীও খাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন নাই, তথাপি এই দুটি সংগ্রহ করিয়া আনিতে দুপুরবেলার সমস্ত রোদটা কেষ্টর মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল। হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ কেষ্ট, কে তোকে বললে আমার জ্বর হয়েচে?

কেষ্ট জবাব দিল না।

কে বললে রে আমি পেয়ারা খেতে চেয়েচি?

কেষ্ট তাহারও জবাব দিল না। সে সেই যে মুখ হেঁট করিল, আর তুলিতেই পারিল না। ছেলেটি যে

অতিশয় লাজুক ও ভীরুস্বভাব, হেমাঙ্গিনী তাহা পূর্বেই টের পাইয়াছিলেন। তখন তাহার মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিয়া, আদর করিয়া 'দাদা' বলিয়া ডাকিয়া, আরও কত কি কৌশলে তাহার ভয় ভাঙ্গাইয়া, অনেক কথা জানিয়া লইলেন। বিস্তর অনুসন্ধানে পেয়ারা-সংগ্রহ করিবার কথা হইতে শুরু করিয়া, তাহাদের দেশের কথা, মায়ের কথা, খাওয়া-দাওয়ার কথা, দোকানে কি কাজ করিতে হয় তাহার কথা, একে একে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া লইয়া চোখ মুছিয়া বলিলেন, এই তোর মেজদিকে কখনও কিছু লুকোস নে কেষ্ট, যখন দরকার হবে চুপি চুপি এসে চেয়ে নিস—নিবি ত ?

কেষ্ট আহ্লাদে মাথা নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা।

সত্যকার স্নেহ যে কি, তাহা দুঃখী মায়ের কাছে কেষ্ট শিখিয়াছিল। এই মেজদির মধ্যে তাহাই আস্বাদ করিয়া কেষ্টর রুদ্ধ মাতৃশোক আজ গলিয়া ঝরিয়া গেল। উঠিবার সময় সে মেজদির পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া যেন বাতাসে ভাসিতে ভাসিতে বাহির হইয়া আসিল।

কিন্তু, তাহার দিদির আক্রোশ তাহার প্রতি প্রতিদিনই বাড়িয়াই চলিত লাগিল। কারণ, সে সৎমার ছেলে, সে নিরুপায়। অখ্যাতির ভয়ে তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়াও যায় না, বিলাইয়া দেওয়াও যায় না। সুতরাং যখন রাখিতেই হইবে, তখন যতদিন তাহার দেহ বহে, ততদিন কষিয়া খাটাইয়া লওয়াই ঠিক।

সে ঘরে ফিরিয়া আসিতেই দিদি ধরিয়া পড়িলেন—সমস্ত দুপুর দোকান পালিয়ে কোথায় ছিলি রে কেষ্ট ?

কেষ্ট চুপ করিয়া রহিল। কাদম্বিনী ভয়ানক রাগিয়া বলিলেন, বল্ শিগগির।

কেষ্ট তথাপি নিরুত্তর হইয়া রহিল। মৌন থাকিলে যাহাদের রাগ পড়ে, কাদম্বিনী সে দলের নহেন। অতএব কথা বলাইবার জন্য তিনি যতই জেদ করিতে লাগিলেন, বলাইতে না পারিয়া তাঁহার ক্রোধ এবং রোখ ততই চড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে পাঁচুগোপালকে ডাকিয়া, তাহার দুই কান পুনঃ পুনঃ মলাইয়া দিলেন এবং তাহার জন্য রাত্রে হাঁড়িতে চাল লইলেন না।

আঘাত যতই গুরুতর হউক, প্রতিহত হইতে না পাইলে লাগে না। পর্বত-শিখর হইতে নিক্ষেপ করিলেই হাত-পা ভাঙ্গে না, ভাঙ্গে শুধু তখনই—যখন—পদতলপৃষ্ট কঠিনভূমি সেই বেগ প্রতিরোধ করে। ঠিক তাহাই হইয়াছিল কেষ্টর। মায়ের মরণ যখন পায়ের নীচের নির্ভরস্থলটুকু তাহার একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিল, তখন হইতে বাহিরের কোন আঘাতেই তাহাকে আঘাত করিয়া ধূলিসাৎ করিয়া দিতে পারিত না। সে দুঃখীর ছেলে, কিন্তু কখনও দুঃখ পায় নাই। লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সহিত তাহার পূর্বপরিচয় ছিল না, তথাপি এখানে আসা অবধি কাদম্বিনীর দেওয়া কঠোর দুঃখকষ্ট সে যে অনায়াসে সহ্য করিতে পারিতেছিল, সে শুধু পায়ের তলায় অবলম্বন ছিল না বলিয়াই। কিন্তু আজ আর পারিল না, আজ সে হেমাঙ্গিনীর মাতৃস্নেহের নির্ভর-ভিত্তির সন্ধান পাইয়াছিল, তাই আজিকার এই অত্যাচার অপমান তাহাকে একেবারে ব্যাকুল করিয়া দিল। মাতাপুত্র এই নিরপরাধ নিরাশ্রয় শিশুকে শাসন করিয়া, লাঞ্ছনা করিয়া, অপমান করিয়া, দণ্ড দিয়া, চলিয়া গেলেন, সে অন্ধকার ভূমিশয্যায় পড়িয়া আজ অনেকদিন পর আবার মাকে স্মরণ করিয়া, মেজদির নাম করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পাঁচ

পরদিন সকালেই কেষ্ট হঠাৎ গুটিগুটি ঘরে ঢুকিয়া হেমাঙ্গিনীর পায়ের কাছে বিছানার একপাশে আসিয়া বসিল। হেমাঙ্গিনী পা দুইটি একটু গুটাইয়া লইয়া সস্নেহে বলিলেন, দোকানে যাসনি কেষ্ট ?

এইবার যাব।

দেরি করিয় নে দাদা, এইবেলা যা, নইলে এক্ষুনি আবার গালাগালি করবে। কেষ্টর মুখ আবার আরক্ত, একবার পাণ্ডুর হইল। যাই, বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার ইতস্ততঃ করিয়া কি একটা বলিতে গিয়া আবার চুপ করিল।

হেমাঙ্গিনী তাহার মনের কথা যেন বুঝিলেন, বলিলেন, কিছু বলবি আমাকে রে ?

কেষ্ট মাটির দিকে চাহিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, কাল কিছু খাইনি মেজদি—

কাল থেকে খাসনি ! বলিস কি কেষ্ট ? কিছুক্ষণ পর্যন্ত হেমাঙ্গিনী স্থির হইয়া রহিলেন, তাহার পর দুই চোখ জলে পূর্ণ হইয়া গেল। সেই জল ঝরঝর করিয়া ঝরিতে লাগিল। তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আর একবার কাছে বসাইয়া, একটি একটি করিয়া সব কথা শুনিয়া লইয়া বলিলেন, কাল রাত্তিরেই কেন এলিনে ?

কেষ্ট চুপ করিয়া রহিল। হেমাঙ্গিনী আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, আমার মাথার দিব্যি রইল ভাই, আজ থেকে আমাকে তোর সেই মরা মা ব'লে মনে করবি।

যথাসময়ে সমস্ত কথা কাদম্বিনীর কানে গেল। তিনি নিজের বাড়ি হইতে মেজবৌকে ডাক দিয়া বলিলেন, ভাইকে কি খাওয়াতে পারিনে যে, তুমি অত কথা তাকে গায়ে পড়ে বলতে গেছ ?

কথার ধরন দেখিয়া হেমাঙ্গিনীর গা-জ্বালা করিয়া উঠিল। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, যদি গায়ে পড়েই ব'লে থাকি তাতেই বা দোষ কি ?

কাদম্বিনী প্রশ্ন করিলেন, তোমার ছেলেটিকে ডেকে এনে আমি যদি এমনি করে বলি, তোমার মানটি থাকে কোথায় শুনি ? তুমি এমন করে না'ই দিলে আমি তাকে শাসন করি কি করে বল দেখি ?

হেমাঙ্গিনী আর সহ্য করিতে পারিল না। বলিল, দিদি, পনর-ষোল বছর এক সঙ্গে ঘর করচি—তোমাকে আমি চিনি। পেটে মেরে আগে তোমার নিজের ছেলেকে শাসন কর, তার পরে পরের ছেলেকে করো, তখন গায়ে পড়ে কথা কইতে যাবো না।

কাদম্বিনী অবাক হইয়া বলিলেন, আমার পাঁচুগোপালের সঙ্গে ওর তুলনা ? দেবতার সঙ্গে বাঁদরের তুলনা ? এর পরে আরও কি যে তুমি বলে বেড়াবে, তাই ভাবি মেজবৌ ?

মেজবৌ উত্তর দিল, কে দেবতা, কে বাঁদর, সে আমি জানি। কিন্তু আর আমি কিছুই বলব না দিদি, যদি বলি ত এই যে—তোমার মত নিষ্ঠুর, তোমার মত বেহায়া মেয়েমানুষ আর সংসারে নেই। বলিয়া তিনি প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন।

সেইদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে অর্থাৎ কর্তারা ঘরে ফিরিবার সময়টিতে বড়বৌ নিজের বাড়ির উঠানে দাঁড়াইয়া দাসীকে উপলক্ষ করিয়া উচ্চকণ্ঠে তর্জন-গর্জন আরম্ভ করিয়া দিলেন—যিনি রাত-দিন কচ্ছেন, তিনিই এর বিহিত করবেন। মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী ! আমার ভায়ের মর্ম আমি বুঝিনে, বোঝে পরে ! কখখনো ভাল হবে না—ভাই-বোনে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখলে ধর্ম সইবেন না—তা ব'লে দিচ্চি, বলিয়া তিনি রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

উভয় জায়ের মধ্যে এই ধরনের গালিগালাজ, শাপ-শাপান্ত অনেকবার অনেক রকম করিয়া হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ ঝাঁজটা কিছু বেশী। অনেক সময় হেমাঙ্গিনী শুনিয়াও শুনিত না, বুঝিয়াও গায়ে মাখিত না ; কিন্তু আজ নাকি তাহার দেহটা খারাপ ছিল, তাই উঠিয়া আসিয়া জানালায় দাঁড়াইয়া কহিল, এর মধ্যে চুপ করলে কেন দিদি ? ভগবান হয়ত শুনতে পাননি—আর খানিকক্ষণ ধরে আমার সর্বনাশ কামনা কর—বঠ্ঠাকুর ঘরে আসুন, তিনি শুনুন, ইনি ঘরে এসে শুনুন—এর মধ্যেই হাঁপিয়ে পড়লে চলবে কেন ?

কাদম্বিনী উঠানের উপর ছুটিয়া আসিয়া মুখ উঁচু করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, আমি কি কোন সর্বনাশীর নাম মুখে এনেচি ?

হেমাঙ্গিনী স্থিরভাবে জবাব দিল, মুখে আনবে কেন দিদি, মুখে আনবার পাত্রী তুমি নও। কিন্তু তুমি কি ঠাওরাও, একা তুমিই সেয়ানা, আর পৃথিবীসুদ্ধ ন্যাকা ? ঠেস দিয়ে দিয়ে কার কপাল ভাঙ্গচ, সে কি কেউ টের পায় না ?

কাদম্বিনী এবার নিজমূর্তি ধরিলেন। মুখ ভ্যাংচাইয়া হাত-পা নাড়িয়া বলিলেন, টের পেলেই বা। যে দোষে থাকবে, তারই গায়ে লাগবে। আর একা তুমিই টের পাও, আমি পাই নে ? কেষ্ট যখন এলো, সাত চড়ে রা করত না, যা বলতুম, মুখ বুজে তাই করত—আজ দুপুরবেলা কার জোরে কি জবাব দিয়ে গেল, জিজ্ঞেস করে দ্যাখো এই প্রসন্নর মাকে,—বলিয়া দাসীকে দেখাইয়া দিল।

প্রসন্নর মা কহিল, সে কথা সত্যি মেজবৌমা। আজ সে ভাত ফেলে উঠে যেতে মা বললেন,—এ পিণ্ডিই না গিললে যখন যমের বাড়ি যেতে হবে, তখন এত তেজ কিসের জন্যে ? সে বলে গেল,—আমার মেজদি
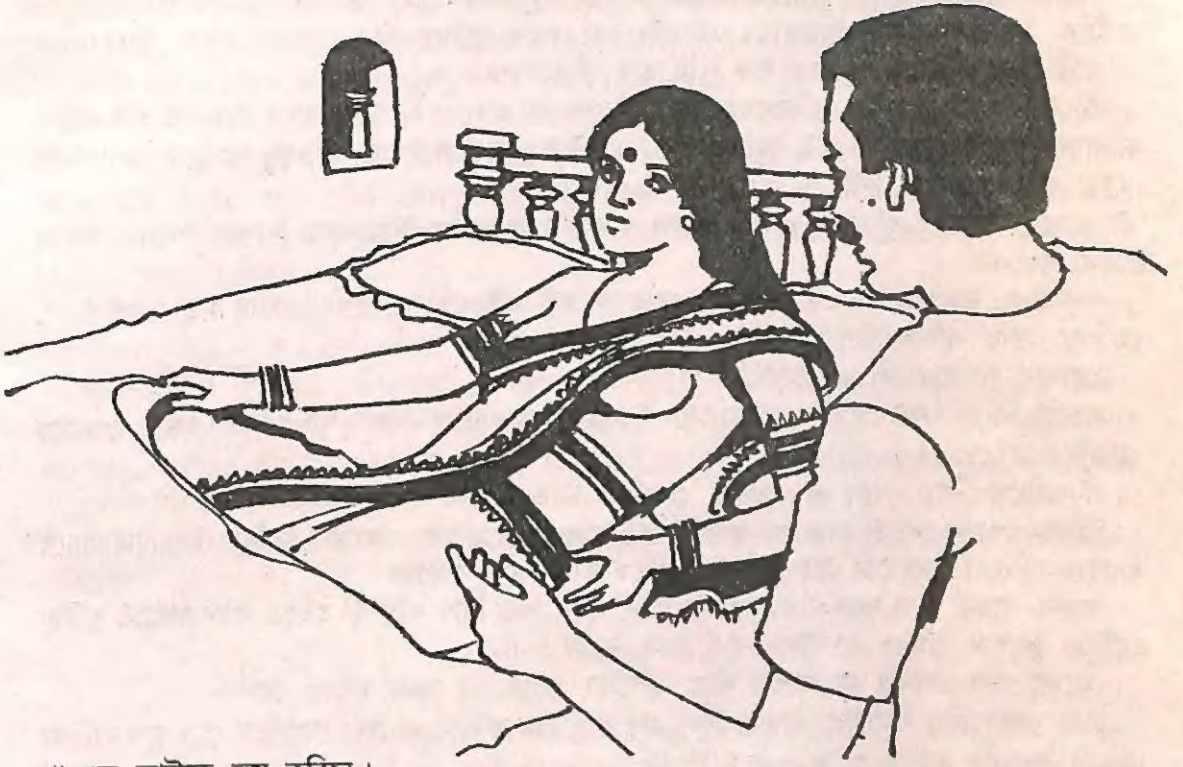
থাকতে কাউকে ভয় করিনে।

কাদম্বিনী সদর্পে বলিলেন, কেমন হ'ল ত! কার জোরে এত তেজ শুনি? আজ আমি স্পষ্ট বলে দিচ্চি, মেজবৌ, ওকে তুমি এক শ'বার ডেকো না। আমাদের ভাইবোনেদের কথার মধ্যে থেকো না।

হেমাঙ্গিনী আর কথা কহিল না। কেঁচো সাপের মতন চক্র ধরিয়া কামড়াইয়াছে শুনিয়া, তাঁহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। জানালা হইতে ফিরিয়া আসিয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল, কত বেশী পীড়নের দ্বারা ইহাও সম্ভব হইতে পারিয়াছে।

আবার মাথা ধরিয়া জ্বর বোধ হইতেছিল, তাই অসময়ে শয্যায় আসিয়া নির্জীবের মত পড়িয়া ছিল। তাহার স্বামী ঘরে ঢুকিয়া, ইহা লক্ষ্য না করিয়াই ক্রোধভরে বলিয়া উঠিলেন, বৌঠানের ভাইকে নিয়ে আজ কি কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছ। কারু মানা শুনবে না, যেখানে যত হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া আছে, দেখলেই তার দিকে কোমর বেঁধে দাঁড়াবে, রোজ রোজ আমার এত হাঙ্গামা সহ্য হয় না মেজবৌ। আজ বৌঠান আমাকে নাহক দশটা কথা শুনিয়ে দিলেন।

হেমাঙ্গিনী শ্রান্তকণ্ঠে কহিলেন, বৌঠান হক কথা কবে বলেন যে আজ তোমাকে নাহক কথা বলেচেন?

বিপিন বলিলেন, কিন্তু আজ তিনি ঠিক কথাই বলেচেন। তোমার স্বভাব জানি ত। সেবার বাড়ির রাখাল ছোঁড়াটাকে নিয়ে এই রকম করলে, মতি কামারের ভাগ্নের অমন বাগানখানা তোমার জন্যই মুঠোর ভেতর থেকে বেরিয়ে গেল, উল্‌টে পুলিশ থামাতে এক শ দেড় শ ঘর থেকে গেল। তুমি নিজের ভাল-মন্দও কি বোঝ না? কবে এ স্বভাব যাবে?

হেমাঙ্গিনী এবার উঠিয়া বসিয়া, স্বামীর মুখপানে চাহিয়া কহিলেন, আমার স্বভাব যাবে মরণ হলে, তার আগে নয়। আমি মা, —আমার কোলে ছেলেপুলে আছে, মাথার ওপর ভগবান আছেন। এর বেশী আমি গুরুজনের নামে নালিশ করতে চাইনে। আমার অসুখ করেচে—আর আমাকে বকিও না—তুমি যাও। বলিয়া গায়ের র‍্যাপারখানা টানিয়া লইয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িল।

বিপিন প্রকাশ্যে আর তর্ক করিতে সাহস করিলেন না, কিন্তু মনে মনে স্ত্রীর উপর এবং বিশেষ করিয়া ঐ গলগ্রহ দুর্ভাগাটার উপর আজ মর্মান্তিক চটিয়া গেলেন।

পরদিন সকালে জানালা খুলিতেই হেমাঙ্গিনীর কানে বড়জায়ের তীক্ষ্ণ-কণ্ঠের ঝঙ্কার প্রবেশ করিল। তিনি স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, ছোঁড়াটা কাল থেকে পালিয়ে রইল, একবার খোঁজ নিলে না?

স্বামী জবাব দিলেন, চুলোয় যাক। কি হবে খোঁজ করে?

স্ত্রী কণ্ঠস্বর সমস্ত পাড়ার শ্রুতিগোচর করিয়া বলিলেন, তা হলে যে নিজেদের গ্রামে বাস করা দায় হবে! আমাদের শত্রু ত দেশে কম নেই, কোথাও প'ড়ে মরে-টরে থাকলে ছেলেবুড়ো বাড়িসুদ্ধু সবাইকে জেলখানায় যেতে হবে, তা বলে দিচ্চি।

হেমাঙ্গিনী সমস্তই বুঝিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

দুপুরবেলা রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া খান-কতক রুটি খাইতেছিলেন, হঠাৎ চোরের মত সন্তর্পণে পা ফেলিয়া কেষ্ট আসিয়া উপস্থিত হইল। চুল রুক্ষ, মুখ শুষ্ক।

কোথায় পালিয়েছিলি রে কেষ্ট?

পালাই নি ত। কাল সন্ধ্যার পর দোকানে শুয়েছিলুম, ঘুম ভেঙ্গে দেখি, দুপুর রাত্তির। ক্ষিদে পেয়েছে মেজদি।

ও-বাড়িতে গিয়ে খেগে যা। বলিয়া হেমাঙ্গিনী নিজের রুটির থালায় মনোযোগ করিলেন।

মিনিট-খানেক চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কেষ্ট চলিয়া যাইতেছিল, হেমাঙ্গিনী ডাকিয়া ফিরাইয়া কাছে বসাইলেন, এবং সেইখানে ঠাঁই করিয়া রাঁধুনিকে ভাত দিতে বলিলেন।

তাহার খাওয়া প্রায় অর্ধেক অগ্রসর হইয়াছিল, এমন সময় উমা বাহির্বাটী হইতে ত্রস্তব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিয়া নিঃশব্দ ইঙ্গিতে জানাইল—বাবা আসচেন যে!

মেয়ের ভাব দেখিয়া মা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, তাতে তুই অমন কচ্চিস কেন?

উমা কেষ্টর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, প্রত্যুত্তরে তাহাকেই আঙুল দিয়া দেখাইয়া, চোখ-মুখ নাড়িয়া তেমনি ইশারায় প্রকাশ করিল—খাচ্চে যে!

কেষ্ট কৌতূহলী হইয়া ঘাড় ফিরাইয়াছিল। উমার উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি, শঙ্কিত মুখের ইশারা তাহার চোখে পড়িল। একমুহূর্তে তাহার মুখ সাদা হইয়া গেল। কি ত্রাস যে তাহার মনে জন্মিল সেই জানে। মেজদি, বাবু আসচেন, বলিয়াই সে ভাত ফেলিয়া ছুটিয়া গিয়া রান্নাঘরের দোরের আড়ালে দাঁড়াইল। তাহার দেখাদেখি উমাও আর একদিকে পলাইয়া গেল। অকস্মাৎ গৃহস্বামীর আগমনে চোরের দল যেরূপ ব্যবহার করে, ইহারাও ঠিক সেইরূপ আচরণ করিয়া বসিল।

প্রথমটা হেমাঙ্গিনী হতবুদ্ধির মত একবার এদিকে একবার ওদিকে চাহিলেন, তার পরে পরিশ্রান্তের মত দেয়ালে ঠেস দিয়া এলাইয়া পড়িলেন। লজ্জা ও অপমানের শূল যেন তাঁহার বুকখানা এফোঁড়-ওফোঁড় করিয়া দিয়া গেল। পরক্ষণেই বিপিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্মুখেই স্ত্রীকে ওভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কাছে আসিয়া উদ্বিগ্ন-মুখে প্রশ্ন করিলেন, ও কি, খাবার নিয়ে অমন করে বসে যে?

হেমাঙ্গিনী জবাব দিলেন না। বিপিন অধিকতর উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, আবার জ্বর হল নাকি? অভুক্ত ভাতের থালাটার পানে চোখ পড়ায় বলিলেন, এখাতে এত ভাত ফেলে উঠে গেল কে? ললিত বুঝি?

হেমাঙ্গিনী উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, না, সে নয়—ও বাড়ির কেষ্টা খাচ্ছিল, তোমার ভয়ে দোরের আড়ালে লুকিয়েছে।

কেন?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, কেন, তা তুমিই ভাল জান। আর শুধু সে নয়। তুমি আসচ খবর দিয়েই উমাও ছুটে পালিয়েচে।

বিপিন মনে মনে বুঝিলেন, স্ত্রীর কথাবার্তা বাঁকা পথ ধরিয়াছে। তাই বোধ করি সোজা পথে ফিরাইবার অভিপ্রায়ে সহাস্যে বলিলেন, ও বেটি পালাতে গেল কি দুঃখে?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, কি জানি? বোধ করি, মায়ের অপমান চোখে দেখবার ভয়েই পালিয়েচে। পরক্ষণেই

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, কেষ্ট পরের ছেলে, সে ত লুকোবেই। পেটের মেয়েটা পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারলে না যে, তার মায়ের কাউকে ডেকে একমুঠো ভাত দেবার অধিকারটুকুও আছে।

এবার বিপিন টের পাইলেন, ব্যাপারটা সত্যই বিশ্রী হইয়া উঠিয়াছে। অতএব পাছে একেবারে বাড়াবাড়িতে গিয়া পৌঁছায়, এজন্য অভিযোগটাকে সামান্য পরিহাসে পরিণত করিয়া চোখ টিপিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না—তোমার কোন অধিকার নেই। ভিখিরী এলে ভিক্ষেও না। সে যাক—কাল থেকে আর মাথা ধরেনি ত ? আমি মনে করচি, শহর থেকে কেদার ডাক্তারকে ডেকে পাঠাই—না হয় একবার কলকাতায়—

অসুখ ও চিকিৎসার পরামর্শটা ঐখানেই থামিয়া গেল। হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, উমার সামনে তুমি কেষ্টকে কিছু বলেছিলে ?

বিপিন যেন আকাশ হইতে পড়িলেন—আমি ? কৈ না। ওহো—সেদিন যেন মনে হচ্চে বলেছিলুম—বৌঠান রাগ করেন—দাদা বিরক্ত হন—উমা বোধ করি সেখানে দাঁড়িয়েছিল—কি জান—

জানি, বলিয়া হেমাঙ্গিনী কথাটা চাপা দিয়া দিলেন। বিপিন ঘরে ঢুকিতেই তিনি কেষ্টকে বাহিরে ডাকিয়া বলিলেন, কেষ্ট, এই চারটে পয়সা নিয়ে দোকান থেকে মুড়িটুড়ি কিছু কিনে খেগে যা। ক্ষিদে পেলে আর আসিস নে আমার কাছে। তোর মেজদির এমন জোর নেই যে. সে বাইরের মানুষকে একমুঠো ভাত খেতে দেয়।

কেষ্ট নিঃশব্দে চলিয়া গেল। ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া বিপিন তাহার পানে চাহিয়া ক্রোধে দাঁত কড়মড় করিলেন।

সাত
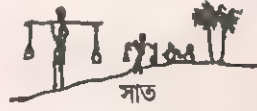
দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন বৈকালে বিপিন অত্যন্ত বিরক্ত-মুখে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, এ-সব কি তুমি শুরু করলে মেজবৌ ? কেষ্ট তোমার কে যে, একটা পরের ছেলে নিয়ে দিন-রাত আপনা-আপনির মধ্যে লড়াই করে বেড়াচ্চ। আজ দেখলাম, দাদা পর্যন্ত ভারী রাগ করেচেন।

অনতিপূর্বে নিজের ঘরে বসিয়া বড়বৌ স্বামীকে উপলক্ষ ও মেজবৌকে লক্ষ্য করিয়া চিৎকার-শব্দে যে-সকল অপভাষার তীর ছুঁড়িয়াছিলেন, তাহার একটিও নিষ্ফল হয় নাই। সব ক'টি আসিয়াই হেমাঙ্গিনীকে বিঁধিয়াছিল এবং প্রত্যেকটি মুখে করিয়া যে পরিমাণ বিষ বহিয়া আনিয়াছিল, তাহার সহিত জ্বালাটাও কম জ্বলিতেছিল না। কিন্তু মাঝখানে ভাশুর বিদ্যমান থাকায় হেমাঙ্গিনী সহ্য করা ব্যতীত প্রতিকারের পথ পাইতেছিল না।

আগেকার দিনে যেমন যবনেরা গরু সুমুখে রাখিয়া রাজপুত-সেনার উপর বাণ বর্ষণ করিত, যুদ্ধ জয় করিত, বড়বৌ মেজবৌকে আজকাল প্রায়ই তেমনি জব্দ করিতেছিলেন।

স্বামীর কথায় হেমাঙ্গিনী দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, বল কি, তিনি পর্যন্ত রাগ করেচেন ? এতবড় আশ্চর্য কথা, শুনলে হঠাৎ বিশ্বাস হয় না যে! এখন কি করলে রাগ থামবে বল ?

বিপিন মনে মনে রাগ করিলেন, কিন্তু বাহিরে প্রকাশ করা তাঁহার স্বভাব নয়, তাই মনের ভাব গোপন করিয়া সহজভাবে বলিলেন, হাজার হলেও গুরুজনের সম্বন্ধে কি—

কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই হেমাঙ্গিনী কহিল, সব জানি, ছেলেমানুষটি নই যে, গুরুজনের মান-মর্যাদা বুঝিনে! কিন্তু ছোঁড়াটাকে ভালবাসি বলেই যেন ওঁরা আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ওকে দিবারাত্র বিঁধতে থাকেন। তাহার কণ্ঠস্বর কিছু নরম শুনাইল। কারণ, হঠাৎ ভাশুরের সম্বন্ধে শ্লেষ করিয়া ফেলিয়া, সে নিজেই মনে মনে অপ্রতিভ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারও গায়ের জ্বালাটা নাকি বড় জ্বলিতেছিল, তাই রাগ সামলাইতে পারেন নাই।

বিপিন গোপনে ও-পক্ষে ছিলেন। কারণ, এই একটা পরের ছেলে লইয়া নিরর্থক দাদাদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি তিনি মনে মনে পছন্দ করিতেন না। স্ত্রীর এই লজ্জাটুকু লক্ষ্য করিয়া জোর দিয়া বলিলেন, বেঁধাবিঁধি কিছুই নয়। তাঁরা নিজেদের ছেলে শাসন করচেন, কাজ শেখাচ্চেন, তাতে তোমাকে বিঁধলে চলবে কেন ? তা ছাড়া যা-ই করুন, তাঁরা গুরুজন যে!

হেমাঙ্গিনী স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া প্রথমটা কিছু বিস্মিত হইল। কারণ, এই পনর-ষোল বছরের ঘরকন্নায়

স্বামীর এত বড় ভ্রাতৃভক্তি সে ইতিপূর্বে দেখে নাই। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাহার সর্বাঙ্গ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, তারা গুরুজন, আমিও মা। গুরুজন নিজের মান নিজে নিঃশেষ করে আনলে আমি কি দিয়ে ভর্তি করব!

বিপিন কি একটা জবাব বোধ করি দিতে যাইতেছিল, থামিয়া গেলেন। দ্বারের বাহিরে কুণ্ঠিতকণ্ঠের বিনম্র ডাক শোনা গেল—

মেজদি!

স্বামী-স্ত্রীতে চোখাচোখি হইল। স্বামী একটু হাসিলেন, তাহাতে প্রীতি বিকীর্ণ হইল না। স্ত্রী অধরে ওষ্ঠ চাপিয়া কবাটের কাছে সরিয়া আসিয়া নিঃশব্দে কেষ্টর মুখের পানে চাহিয়াই সে আহ্লাদে গলিয়া গিয়া প্রথমেই যা মুখে আসিল কহিল, কেমন আছ মেজদি?

হেমাঙ্গিনী একমুহূর্ত কথা কহিতে পারিল না। যাহার জন্য স্বামী-স্ত্রীতে এইমাত্র বিবাদ হইয়া গেল, অকস্মাৎ তাহাকে সুমুখে পাইয়া বিবাদের সমস্ত বিরক্তিটা তাহারই মাথায় গিয়া পড়িল। হেমাঙ্গিনী অনুচ্চ কণ্ঠস্বরে কহিলেন, এখানে কি? কেন তুই রোজ রোজ আসিস বল ত?

কেষ্টর বুকের ভিতরটা ধক করিয়া উঠিল। এই কঠোর কণ্ঠস্বরটা সত্যই এত কঠোর শুনাইল যে, হেতু ইহার যা-ই হোক, বস্তুটা যে সস্নেহ পরিহাস নয়, বুঝিয়া লইতে এই দুর্ভাগ্য বালকটারও বিলম্ব হইল না। ভয়ে, বিস্ময়ে, লজ্জায় মুখখানা তাহার কালিমাখা হইয়া গেল। কহিল, দেখতে এসেচি।

বিপিন হাসিয়া বলিলেন, দেখতে এসেচে তোমাকে। এ হাসি যেন দাঁত ভ্যাংচাইয়া হেমাঙ্গিনীকে অপমান করিল। সে দলিতা ভুজঙ্গিনীর মত স্বামীর মুখের পানে একটিবার চাহিয়াই চোখ ফিরাইয়া লইয়া কহিল, আর এখানে তুই আসিস নে। —যা।

আচ্ছা, বলিয়া কেষ্ট তাহার মুখের কালি হাসি দিয়া ঢাকিতে গিয়া সমস্ত মুখ আরো কালো, আরো বিশ্রী বিকৃত করিয়া অধোমুখে চলিয়া গেল।

সে বিকৃতির কালোছায়া হেমাঙ্গিনী নিজের মুখের উপর লইয়া স্বামীর পানে আর একবার চাহিয়া দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

আট

দিন পাঁচ-ছয় হইয়া গেল, হেমাঙ্গিনীর জ্বর ছাড়ে নাই। কাল ডাক্তার বলিয়া গিয়াছিলেন, সর্দি বুকে বসিয়াছে। সন্ধ্যার দীপ সবেমাত্র জ্বালা হইয়াছিল, ললিত ভাল কাপড়-জামা পরিয়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল, মা, দত্তদের বাড়ি পুতুল-নাচ হবে, দেখতে যাব?

মা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, হাঁ রে ললিত, তোর মা যে এই পাঁচ-ছ দিন পড়ে আছে, একবারটি কাছে এসেও ত বসিস নে!

ললিত লজ্জা পাইয়া শিয়রের কাছে আসিয়া বসিল। মা সস্নেহে ছেলের পিঠে হাত দিয়া বলিলেন, এই অসুখ যদি না সারে, যদি মরে যাই, কি করিস তুই? খুব কাঁদিস?

যাঃ—সেরে যাবে, বলিয়া ললিত মায়ের বুকের উপর একটা হাত রাখিল। মা ছেলের হাতখানি হাতে লইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। জ্বরের উপর এই স্পর্শ তাহার সর্বাঙ্গ জুড়াইয়া দিতে লাগিল। ইচ্ছা করিতে লাগিল, এমন করিয়া বহুক্ষণ কাটান। কিন্তু একটু পরেই ললিত উসখুস করিতে লাগিল, পুতুল নাচ হয়ত এতক্ষণে শুরু হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া, ভিতরে ভিতরে তাহার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল।

ছেলের মনের কথা বুঝিতে পারিয়া মা মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা যা, দেখে আয়, বেশী রাত করিস নে যেন।

না মা, এক্ষুণি ফিরে আসব, বলিয়া ললিত ঘরের বাহির হইয়া গেল। কিন্তু মিনিট দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, মা, একটা কথা বলব?
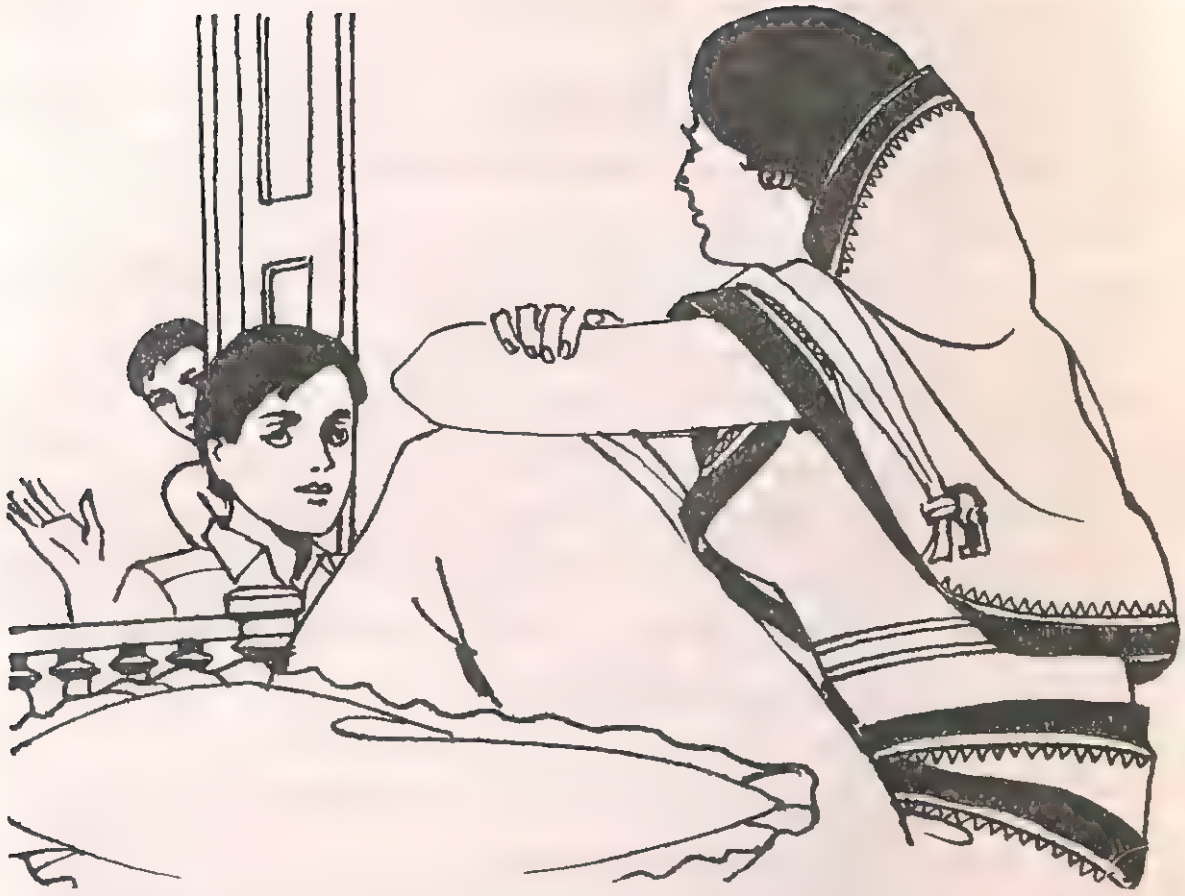
মা হাসিমুখে বলিলেন, একটা টাকা চাই ত ? ঐ কুলুঙ্গিতে আছে, নিগে—দেখিস, বেশী নিসনে যেন।

না মা, টাকা চাইনে। বলি, তুমি শুনবে !

মা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, টাকা চাইনে ? তবে কি কথা রে ?

ললিত আর একটু কাছে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, কেষ্টমামাকে একবার আসতে দেবে ? ঘরে ঢুকবে না—ঐ দোরগোড়া থেকে একটিবার তোমাকে দেখেই চলে যাবে। কালকেও বাইরে এসে বসেছিল, আজকেও এসে বসে আছে।

হেমাঙ্গিনী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন—যা যা ললিত, এক্ষুণি ডেকে নিয়ে আয়—আহা হা, বসে আছে, তোরা কেউ আমাকে জানাস নি রে ?

ভয়ে আসতে চায় না যে, বলিয়া ললিত চলিয়া গেল। মিনিট-খানেক পরে কেষ্ট ঘরে ঢুকিয়া মাটির দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল।

হেমাঙ্গিনী ডাকিলেন, এস দাদা, এস।

কেষ্ট তেমনিভাবে স্থির হইয়া রহিল। তিনি নিজে তখন উঠিয়া আসিয়া কেষ্টর হাত ধরিয়া বিছানায় লইয়া গেলেন। পিঠে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিলেন, হাঁ রে কেষ্ট, বকেছিলুম বলে তোর মেজদিদিকে ভুলে গেছিস বুঝি ?

সহসা কেষ্ট ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। হেমাঙ্গিনী কিছু আশ্চর্য হইলেন, কারণ, কখনও কেহ তাহাকে কাঁদিতে দেখে নাই। অনেক দুঃখ-কষ্ট যাতনা দিলেও সে ঘাড় হেঁট করিয়া নিঃশব্দে থাকে, লোকজনের সুমুখে জল ফেলে না। তাহার এই স্বভাবটি হেমাঙ্গিনী জানিতেন বলিয়াই বড় আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, ছি কান্না কিসের ? বেটাছেলেকে চোখের জল ফেলতে আছে কি ?

প্রত্যুত্তরে কেষ্ট কোঁচার খুঁট মুখে গুঁজিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় কান্না রোধ করিতে করিতে বলিল, ডাক্তার বলে যে, বুকে সর্দি বসেচে ?

হেমাঙ্গিনী হাসিলেন—এইজন্যে ? ছি ছি ! কি ছেলেমানুষ তুই রে ! বলিতে বলিতে তাহার নিজের চোখ দিয়াও টপটপ করিয়া দু-ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। বাঁ-হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া তাহার মাথায় একটা হাত দিয়া কৌতুক করিয়া বলিলেন, সর্দি বসেচে—বসলেই বা রে ! যদি মরি, তুই আর ললিত কাঁধে করে গঙ্গায় দিয়ে আসবি—কেমন, পারবি নে ?

বলি, মেজবৌ, কেমন আছ আজ ? বলিয়া বড়বৌ দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণকাল কেষ্টর পানে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, এই যে ইনি এসে হাজির হয়েছেন। আবার ও কি ? মেজগিন্নীর কাছে কেঁদে সোহাগ করা হচ্ছে যে ! ন্যাকা আমার, কত ফন্দিই জানে !

ক্লান্তিবশতঃ হেমাঙ্গিনী এইমাত্র বালিশে হেলান দিয়া কাত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তীরের মত সোজা উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, দিদি, আমার ছ-সাতদিন জ্বর, তোমার পায়ে পড়ি, আজ তুমি যাও।

কাদম্বিনী প্রথমটা থতমত খাইয়া গেলেন। কিন্তু পরক্ষণে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, তোমাকে ত বলিনি মেজবৌ। নিজের ভাইকে শাসন কচ্ছি, তুমি এমন মারমুখী হয়ে উঠচ কেন ?

হেমাঙ্গিনী বলিল, শাসন ত রাত্রিদিনই চলচে—বাড়ি গিয়ে করো, এখানে আমার সামনে করবার দরকার নেই, করতেও দেব না।

কেন, তুমি কি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে না কি ?

হেমাঙ্গিনী হাতজোড় করিয়া বলিল, আমার বড় অসুখ দিদি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, হয় চুপ কর—নয় যাও।

কাদম্বিনী বলিলেন, নিজের ভাইকে শাসন করতে পাব না ?

হেমাঙ্গিনী জবাব দিল, বাড়ি গিয়ে কর গে।

সে আজ ভাল করেই হবে। আমার নামে লাগান-ভাঙান আজ বার করব—বজ্জাত মিথ্যুক কোথাকার ! বললুম গরুর দড়ি নেই কেষ্ট, দু-আঁটি পাট কেটে দে, —না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, পুতুলনাচ দেখে আসি এই বুঝি পুতুলের নাচ হচ্চে রে ? বলিয়া কাদম্বিনী গুমগুম করিয়া পা ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

হেমাঙ্গিনী কতক্ষণ কাঠের মত বসিয়া থাকিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল, কেন তুই পুতুলনাচ দেখতে গেলিনি কেষ্ট ? গেলে ত আর এইসব হ'ত না। আসতে যখন তোকে ওরা দেয় না ভাই, তখন আর আসিস নে আমার কাছে।

কেষ্ট আর কথাটি না কহিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমাদের গাঁয়ের বিশালাক্ষী ঠাকুর বড় জাগ্রত মেজদি, পূজো দিলে অসুখ সেরে যায়। দাও না মেজদি !

এইমাত্র নিরর্থক ঝগড়া হইয়া যাওয়ায় হেমাঙ্গিনীর মনটা ভারী বিগড়াইয়া গিয়াছিল, ঝগড়াঝাঁটি ত হয়ই—সেজন্যও নয়। এমন একটা রসাল ছুতা পাইয়া এই হতভাগার দুর্দশা যে কিরূপ হইবে, আসলে সেই কথাটা মনে মনে তোলপাড়া করিয়া তাহার বুকের ভিতরটা ক্ষোভে ও নিরুপায় আক্রোশে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। কেষ্ট ফিরিয়া আসিতেই হেমাঙ্গিনী উঠিয়া বসিল, এবং কাছে বসাইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। চোখ মুছিয়া বলিল, আমি ভাল হয়ে তোকে লুকিয়ে পূজো দিতে পাঠিয়ে দেব। পারবি একলা যেতে ?

কেষ্ট উৎসাহে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, একলা যেতে খুব পারব। তুমি আজকে আমাকে একটা টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দাও না, মেজদি—আমি কাল সকালেই পূজো দিয়ে তোমাকে প্রসাদ এনে দেব। সে খেলে তক্ষুণি অসুখ সেরে যাবে ! দাও না মেজদি আজকেই পাঠিয়ে।

হেমাঙ্গিনী দেখিলেন, তাহার আর সবুর সয় না। বলিলেন, কিন্তু কাল ফিরে এলে তোকে যে এরা ভারী মারবে ! মারধরের কথা শুনিয়া প্রথমটা কেষ্ট দমিয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই প্রফুল্ল হইয়া কহিল, মারুক গে। তোমার অসুখ সেরে যাবে ত।

আবার তাঁহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। বলিলেন, হ্যাঁ রে কেষ্ট, আমি তোর কেউ নই, তবে আমার জন্যে তোর এত মাথাব্যথা কেন ?

এ প্রশ্নের উত্তর কেষ্ট কোথায় পাইবে ? সে কি করিয়া বুঝাইবে, তাহার পীড়িত আর্ত হৃদয় দিবারাত্র কাঁদিয়া

কাঁদিয়া তাহার মাকে খুঁজিয়া ফেরিতেছে। একটুখানি মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তোমার অসুখ যে সারচে না মেজদি—বুকে সর্দি বসেচে যে!

হেমাঙ্গিনী এবার একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আমার সর্দি বসেচে তাতে তোর কি? তোর এত ভাবনা হয় কেন?

কেষ্ট আশ্চর্য হইয়া বলিল, ভাবনা হবে না মেজদি, বুকে সর্দি বসা যে বড় খারাপ। অসুখ যদি বেড়ে যায়, তা হলে?

তা হলে তোকে ডেকে পাঠাব। কিন্তু না ডেকে পাঠালে আর আসিস নে ভাই।

কেন মেজদি?

হেমাঙ্গিনী দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, তোকে আর আমি এখানে আসতে দেব না। না ডেকে পাঠালেও যদি আসিস তা হলে ভারী রাগ করব।

কেষ্ট মুখপানে চাহিয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে বল, কাল সকালে কখন ডেকে পাঠাবে?

কাল সকালেই আবার তোর আসা চাই?

কেষ্ট অপ্রতিভ হইয়া বলিল, আচ্ছা, সকালে না হয় দুপুরবেলায় আসব—না মেজদি? তাহার চোখে মুখে এমনই একটা ব্যাকুল অনুনয় ফুটিয়া উঠিল যে, হেমাঙ্গিনী মনে মনে ব্যথা পাইলেন। কিন্তু আর ত তাঁহার কঠিন না হইলে নয়। সবাই মিলিয়া এই নিরীহ একান্ত অসহায় বালকের উপর যে নির্যাতন শুরু করিয়াছে, কোনো কারণেই আর ত তাহা বাড়াইয়া দেওয়া চলে না। সে হয়ত সহিতে পারে, মেজদির কাছে আসা-যাওয়া করিবার দণ্ড যত গুরুতর হোক সে হয়ত সহ্য করিতে পিছাইবে না; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি নিজে কি করিয়া সহিবেন?

হেমাঙ্গিনীর চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল; তথাপি তিনি মুখ ফিরাইয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন, বিরক্ত করিস নে কেষ্ট, যা এখান থেকে। ডেকে পাঠালে আসিস, নইলে যখন তখন এসে আমাকে বিরক্ত করিস নে।

না বিরক্ত করিনি ত, বলিয়া ভীত লজ্জিত মুখখানি হেঁট করিয়া তাড়াতাড়ি কেষ্ট উঠিয়া গেল।

এইবার হেমাঙ্গিনীর দুই চোখ বাহিয়া প্রস্রবণের মত জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি সুস্পষ্ট দেখিতে লাগিলেন, এই নিরুপায় অনাথ ছেলেটা মা হারাইয়া তাঁকে মা বলিয়া আশ্রয় করিতেছে। তাঁহারই আঁচলের অল্প একটুখানি মাথায় টানিয়া লইবার জন্য কাঙালের মত কি করিয়াই না বেড়াইতেছে।

হেমাঙ্গিনী চোখ মুছিয়া মনে মনে বলিলেন, কেষ্ট, মুখখানি অমন করে গেলি ভাই, কিন্তু তোর এই মেজদি যে তোর চেয়েও নিরুপায়! তোকে জোর করে বুকে টেনে আনবে সে ক্ষমতা যে তাঁর নেই ভাই।

উমা আসিয়া কহিল, মা, কাল কেষ্টমামা তাগাদায় না গিয়া, তোমার কাছে এসে বসেছিল বলে, জ্যাঠামহাশয় এমন মার মারলেন যে, নাক দি—

হেমাঙ্গিনি ধমকিয়া উঠিলেন—আচ্ছা-হয়েচে—হয়েচে—যা তুই এখান থেকে। অকস্মাৎ ধমকানি খাইয়া উমা চমকিয়া উঠিল। আর কোন কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিল; মা ডাকিয়া বলিলেন, শোন রে। নাক দিয়ে কি খুব রক্ত পড়েছিল?

উমা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না খুব নয় একটুখানি।

আচ্ছা তুই যা।

উমা কবাটের কাছে আসিয়াই বলিয়া উঠিল, মা, এই যে কেষ্টমামা দাঁড়িয়ে রয়েচে।

কেষ্ট শুনিতে পাইল। বোধ করি ইহাকে অভ্যর্থনা মনে করিয়া মুখ বাড়াইয়া সলজ্জ হাসি হাসিয়া কহিল, কেমন আছ মেজদি?

ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে হেমাঙ্গিনী ক্ষিপ্তবৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—কেন এসেচিস এখানে? যা, যা বলচি শিগ্‌গির। দূর হ' বলচি—

কেষ্ট মূঢ়ের মত ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল,—হেমাঙ্গিনী অধিকতর তীক্ষ্ণ তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, তবু দাঁড়িয়ে রইলি হতভাগা—গেলিনে?'

কেষ্ট মুখ নামাইয়া শুধু 'যাচ্ছি' বলিয়াই চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে হেমাঙ্গিনী নির্জীবের মত বিছানার একধারে শুইয়া পড়িয়া অস্ফুটে ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলেন, এক শ'বার বলি হতভাগাকে, আসিস্ নে আমার কাছে—তবু 'মেজদি'। শিবুকে বলে দিস ত উমা, ওকে না আর ঢুকতে দেয়।

উমা জবাব দিল না। ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রে হেমাঙ্গিনী স্বামীকে ডাকাইয়া আনিয়া কাঁদ-কাঁদ গলায় বলিল, কোনদিন ত তোমার কাছে কিছু চাইনি—আজ এই অসুখের উপর একটা ভিক্ষা চাইচি, দেবে ?

বিপিন সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, কি চাই ?

হেমাঙ্গিনী বলিল, কেষ্টকে আমাকে দাও—ও বেচারী বড় দুঃখী—মা-বাপ নেই—ওকে ওরা মেরে ফেলচে,—এ আর আমি চোখে দেখতে পারচি নে।

বিপিন মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তা হলে চোখ বুজে থাকলেই ত হয়।

স্বামীর এই নিষ্ঠুর বিদ্রূপ হেমাঙ্গিনীকে শূল দিয়া বিঁধিল, অন্য কোন অবস্থায় সে ইহা সহিতে পারিত না, কিন্তু আজ নাকি তাহার দুঃখে প্রাণ বাহির হইতেছিল, তাই সহ্য করিয়া লইয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, তোমার দিব্যি করে বলচি, ওকে আমি পেটের ছেলের মত ভালবেসেচি। দাও আমাকে—মানুষ করি—খাওয়াই-পরাই—তার পরে যা ইচ্ছে হয় তোমাদের তাই ক'রো। বড় হলে আমি একটি কথাও কবো না।

বিপিন একটুখানি নরম হইয়া বলিলেন, ও কি আমার গোলার ধান-চাল যে তোমাকে এনে দেব ? পরের ভাই, পরের বাড়ি এসেচে—তোমার মাঝখানে পড়ে এত দরদ কিসের জন্যে ?

হেমাঙ্গিনী কাঁদিয়া ফেলিল। খানিক পরে চোখ মুছিয়া বলিল, তুমি ইচ্ছে করলে বঠ্‌ঠাকুরকে বলে, দিদিকে বলে, স্বচ্ছন্দে আনতে পার। তোমার দুটি পায়ে পড়চি, দাও তাকে।

বিপিন বলিলেন, আচ্ছা, তাই যদি হয়, আমিই বা এত বড়মানুষ কিসে যে, তাকে প্রতিপালন করব ?

হেমাঙ্গিনী বলিল, তুমি আগে আমার একটা তুচ্ছ কথাও ঠেলতে না, এখন কি অপরাধ করেচি যে, যখন এমন করে জানাচ্ছি,—বলচি, সত্যিই আমার প্রাণ বার হয়ে যাচ্ছে—তবু এই সামান্য কথাটা রাখতে চাইচ না ? সে দুর্ভাগা বলে কি তোমরা সকলে মিলে তাকে মেরে ফেলবে ? আমি তাকে আমার কাছে আসতে বলব, দেখি ওঁরা কি করেন।

বিপিন এবার রুষ্ট হইলেন। বলিলেন, আমি খাওয়াতে পারব না।

হেমাঙ্গিনী কহিল, আমি পারব। আমি কি বাড়ির কেউ নই যে, নিজের ছেলেকে খাওয়াতে পারব না। আমি কালই তাকে আমার কাছে এনে রাখব। দিদিরা জোর করেন ত আমি তাকে থানায় দারোগার কাছে পাঠিয়ে দেব।

স্ত্রীর কথা শুনিয়া বিপিন ক্রোধে অভিমানে ক্ষণকাল অবাক হইয়া থাকিয়া বলিলেন, আচ্ছা, সে দেখা যাবে, বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

পরদিন প্রভাত হইতেই বৃষ্টি পড়িতেছিল, হেমাঙ্গিনী জানালাটা খুলিয়া দিয়া আকাশের পানে চাহিয়াছিলেন, সহসা পাঁচুগোপালের উচ্চ কণ্ঠস্বর কানে গেল। সে চেঁচাইয়া বলিতেছিল, মা, তোমার গুণধর ভাই জলে ভিজতে ভিজতে এসে হাজির হয়েচে।

খ্যাংরা কোথায় রে ? যাচ্ছি আমি, বলিয়া কাদম্বিনী হুঙ্কার দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া মাথায় গামছা দিয়া দ্রুতপদে সদর-বাড়িতে ছুটিয়া গেলেন।

হেমাঙ্গিনীর বুকটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। ললিতকে ডাকিয়া বলিলেন, যা ত বাবা, ও-বাড়ির সদরে। দেখ ত, তোর কেষ্টমামা কোথা থেকে এল ?

ললিত ছুটিয়া চলিয়া গেল, এবং খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, পাঁচুদা তাকে নাড়ুগোপাল করে মাথায় দুটো থান ইঁট দিয়ে বসিয়ে রেখেচে।

হেমাঙ্গিনী শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করেছিল সে ?

ললিত বলিল, কাল দুপুরবেলা তাকে তাগাদা করতে পাঠিয়েছিল গয়লাদের কাছে, তিন টাকা আদায় করে নিয়ে পালিয়েছিল, সব খরচ করে এই আসচে।

হেমাঙ্গিনী বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, কে বললে, সে টাকা আদায় করেছিল ?

লক্ষ্মণ গয়লা নিজে এসে বলে গেছে, বলিয়া ললিত পড়িতে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা দুই-তিন আর কোন গোলযোগ শোনা গেল না। বেলা দশটার সময় রাঁধুনি খান-কতক রুটি দিয়া

গিয়াছিল, হেমাঙ্গিনী বসিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমনি সময় তাঁহারই ঘরের বাহিরে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া গেল। বড়গিন্নীর পশ্চাতে পাঁচুগোপাল কেষ্টর কান ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনিতেছে, সঙ্গে বড়কর্তাও আছেন। মেজকর্তাকেও আনিবার জন্য দোকানে লোক পাঠানো হইয়াছে।

হেমাঙ্গিনী শশব্যস্তে মাথায় কাপড় দিয়া ঘরের একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইতেই বড়কর্তা তীব্র কটুকণ্ঠে শুরু করিয়া দিলেন, তোমার জন্যে আর ত আমরা বাড়িতে টিকতে পারিনে মেজবৌমা। বিপিনকে বল, আমাদের বাড়ির দামটা ফেলে দিক, আমরা আর কোথাও উঠে যাই।

হেমাঙ্গিনী বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন বড়গিন্নী যুদ্ধপরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া দ্বারের ঠিক সুমুখে সরিয়া আসিয়া, হাত-মুখ নাড়িয়া বলিলেন, মেজবৌ, আমি বড়-জা, তা আমাকেও কুকুর-শিয়াল মনে কর—তা ভালই কর, কিন্তু হাজার দিন বলেচি, মিছে লোক-দেখান আহ্লাদ দিয়ে, আমার ভায়ের মাথাটি খেয়ো না—কেমন এখন ঘটল ত ? ওগো, দু'দিন সোহাগ করা সহজ, কিন্তু চিরকালের ভারটি ত তুমি নেবে না—সে ত আমাকেই সইতে হবে ?

ইহা যে কটূক্তি এবং আক্রমণ তাহাই শুধু হেমাঙ্গিনী বুঝিল—আর কিছু নয়। মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েচে ?

কাদম্বিনী আরো বেশী হাত-মুখ নাড়িয়া কহিলেন, বেশ হয়েছে—খুব চমৎকার হয়েছে। তোমার শেখানোর গুণে আদায়ী টাকা চুরি করতে শিখেচে—আর দু'দিন কাছে ডেকে আরো দুটো শলাপরামর্শ দাও, তা হলে সিন্দুক ভাঙ্গতে, সিঁদ কাটতেও শিখবে।

একে হেমাঙ্গিনী পীড়িত, তাহার উপর এই কদর্য বিদ্রূপ ও মিথ্যা অভিযোগ—আজ সে জ্ঞান হারাইল। ইতিপূর্বে কখনও কোন কারণে ভাশুরের সুমুখে কথা কহে নাই ; কিন্তু আজ আর থাকিতে পারিল না। মৃদুকণ্ঠে কহিল, আমি কি তাকে চুরি-ডাকাতি করতে শিখিয়ে দিয়েছে দিদি ?

কাদম্বিনী স্বচ্ছন্দে বলিলেন, কেমন করে জানব, কি তুমি শিখিয়ে দিয়েচ, না দিয়েচ। এ স্বভাব তার ত আগে ছিল না, এখনই বা হ'ল কেন ? এত লুকোচুরির কথাবার্তাই বা তোমাদের কি, আর এত আহ্লাদ দেওয়াই বা কি জন্যে ? কতদিনের পুঞ্জীভূত আবদ্ধ বিদ্বেষরাশি যে এই একটু পথ পাইয়া বাহির হইয়া আসিল, তাহা যিনি সব দেখেন, তিনি দেখিতে পাইলেন।

মুহূর্তকালের জন্য হেমাঙ্গিনী হতজ্ঞানের মত স্তম্ভিত হইয়া রহিল। এমন নিষ্ঠুর আঘাত, এত বড় নির্লজ্জ অপমান, মানুষ মানুষকে যে করিতে পারে, ইহা যেন তাহার মাথায় প্রবেশ করিল না। কিন্তু ঐ মুহূর্তকালের জন্য। পরক্ষণেই সে মর্মান্তিক আহত সিংহীর মত দুই চোখে আগুন জ্বালিয়া বাহির হইয়া আসিল। ভাশুরকে সম্মুখে দেখিয়া মাথায় কাপড় আর একটু টানিয়া দিল, কিন্তু রাগ সামলাইতে পারিল না। বড়-জাকে সম্বোধন করিয়া মৃদু অথচ কঠোরস্বরে বলিল, তুমি এতবড় চামার যে, তোমার সঙ্গে কথা কইতেও আমার ঘৃণা বোধ হয়। তুমি এতবড় বেহায়া মেয়েমানুষ যে, ঐ ছোঁড়াটাকে ভাই বলেও পরিচয় দিচ্চ। মানুষ জানোয়ার পুষলে তাকেও পেট ভরে খেতে দেয়, কিন্তু ঐ হতভাগাটাকে দিয়ে যত-রকমের ছোট কাজ করিয়ে নিয়েও তোমরা আজ পর্যন্ত একদিন পেট ভরে খেতে দাও না। আমি না থাকলে এতদিনে ও না খেতে পেয়েই মরে যেত। ও পেটের জ্বালায় শুধু ছুটে আসে আমার কাছে, সোহাগ-আহ্লাদ করতে আসে না।

বড়-জা বলিলেন, আমরা খেতে দিইনে, শুধু খাটিয়ে নিই,—আর তুমি ওকে খেতে দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেচ ?

হেমাঙ্গিনী জবাব দিল, ঠিক তাই। আজ পর্যন্ত কখনও ওকে দু'বেলা তোমরা খেতে দাওনি—কেবল মারধর করেচ, আর যত পেরেচ খাটিয়ে নিয়েচ। তোমার ভয়ে আমি হাজার দিন ওকে আসতে বারণ করেচি, কিন্তু খিদে বরদাস্ত করতে পারে না, আর আমার কাছে পেট ভরে দুটো খেতে পায় বলেই ছুটে ছুটে আসে—চুরি-ডাকাতির পরামর্শ নিতে আসে না। কিন্তু তোমরা এতবড় হিংসুক যে, তাও চোখে দেখতে পার না।

এবার ভাশুর জবাব দিলেন। কেষ্টকে সুমুখে টানিয়া আনিয়া তাহার কোঁচার খুঁট খুলিয়া একটা কলাপাতার ঠোঙ্গা বাহির করিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, হিংসুক আমরা ! কেন যে ওরে ভাল চোখে দেখতে পারিনে, তা তুমিই নিজের চোখে দ্যাখো। মেজবৌমা, তোমার শেখানর গুণেই ও আমার টাকা চুরি ক'রে তোমার ভালোর জন্যে কোন্ একটা ঠাকুরের পুজো দিয়ে প্রসাদ এনেচে—এই নাও ; বলিয়া তিনি গোটা-দুই সন্দেশ ও ফুল বেলপাতা ঠোঙ্গার ভিতর হইতে বাহির করিয়া দেখাইলেন।

কাদম্বিনী চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, মা গো ! কি মিটমিটে শয়তান, কি ধড়িবাজ ছেলে ! বেশ ত মেজবৌ, এখন তুমি বল না, কি মতলবে ও চুরি করেচে ? ও কি আমার ভালোর জন্যে ?

হেমাঙ্গিনী ক্রোধে জ্ঞান হারাইল। একে তাহার অসুস্থ শরীর, তাহাতে এই সমস্ত মিথ্যা অভিযোগ, সে দ্রুতপদে কেষ্টর সম্মুখীন হইয়া তাহার দুই গালে সশব্দে চড় কষাইয়া দিয়া কহিলেন, বদমাইশ চোর, আমি তোকে চুরি করতে শিখিয়ে দিয়েচি ? কতদিন তোকে আমার বাড়ি ঢুকতে বারণ করেচি, কতবার তোকে তাড়িয়ে দিয়েচি। আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, তুই চুরির মতলবেই যখন তখন এসে উঁকি মেরে দেখতিস।

ইতিপূর্বেই বাড়ির সকলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। শিবু কহিল, আমি নিজের চক্ষে দেখেছি মা, পরশু রাত্তিরে ও তোমার ঘরের সমুখে আঁধারে দাঁড়িয়েছিল, আমাকে দেখেই ছুটে পালিয়ে গেল। আমি এসে না পড়লে নিশ্চয় তোমার ঘরে ঢুকে চুরি করত।

পাঁচুগোপাল বলিল, জানে মেজখুড়ীমার অসুখ শরীর—সন্ধ্যা হলেই ঘুমিয়ে পড়েন—ও কি কম চালাক !

মেজবৌয়ের কেষ্টর প্রতি আজকের ব্যবহারে কাদম্বিনী যেরূপ প্রসন্ন হইলেন, এই ষোল বৎসরের মধ্যে কখনও এরূপ হন নাই। অত্যন্ত খুশী হইয়া কহিলেন, ভিজে বেড়াল ! কেমন করে জানব মেজবৌ, তুমি ওকে বাড়ি ঢুকতেও বারণ করেচ। ও বলে বেড়ায়, মেজদি আমাকে মায়ের চেয়ে ভালবাসে। ঠোঙ্গাসুদ্ধ নির্মাল্য টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, টাকা তিনটে চুরি করে কোথা থেকে দুটো ফুলটুল কুড়িয়ে এনেচে।

বাড়ি লইয়া গিয়া বড়কর্তা চোরের শাস্তি শুরু করিলেন। সে কি নির্দয় প্রহার! কেষ্ট কথাও কহে না, কাঁদেও না। এদিকে মারিলে ওদিকে মুখ ফিরায়, ওদিকে মারিলে এদিকে মুখ ফিরায়। ভারী গাড়িসুদ্ধ গরু কাদায় পড়িয়া যেমন করিয়া মার খায়, তেমনি করিয়া কেষ্ট নিঃশব্দে মার খাইল। এমন কি, কাদম্বিনী পর্যন্ত স্বীকার করিলেন, হাঁ মার খাইতে শিখিয়াছিল বটে! কিন্তু ভগবান জানেন, এখানে আসার পূর্বে নিরীহ স্বভাবের গুণে কখন কেহ তাহার গায়ে হাত তুলে নাই।

হেমাঙ্গিনী নিজের ঘরের ভিতর সমস্ত জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া কাঠের মূর্তির মত বসিয়াছিল। উমা মার দেখিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, জ্যাঠাইমা বললেন, কেষ্টমামা বড় হলে ডাকাত হবে। ওদের গাঁয়ে কি ঠাকুর আছে—

উমা— ?

মায়ের অশ্রুবিকৃত ভগ্ন কণ্ঠস্বরে উমা চমকাইয়া উঠিল। কাছে আসিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কেন মা?

হাঁ রে, এখনো কি তাকে সবাই মিলে মারচে? বলিয়াই তিনি মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

মায়ের কান্না দেখিয়া উমাও কাঁদিয়া ফেলিল। তার পর কাছে বসিয়া, আঁচল দিয়া জননীর চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, পেসন্নর মা কেষ্টমামাকে বাইরে টেনে নিয়ে গেছে।

হেমাঙ্গিনী আর কথা কহিলেন না, সেইখানে তেমনি করিয়াই পড়িয়া রহিলেন। বেলা দু-তিনটার সময় সহসা কম্প দিয়া ভয়ানক জ্বর আসিল। আজ অনেক দিন পর পথ্য করিতে বসিয়াছিল—সে খাবার তখনও একধারে পড়িয়া শুকাইতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর বিপিন ও-বাড়িতে বৌঠানের মুখে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া ক্রোধভরে স্ত্রীর ঘরে ঢুকিতেছিলেন, উমা কাছে আসিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল, মা জ্বরে অজ্ঞান হয়ে আছেন।

বিপিন চমকাইয়া উঠিলেন—সে কি রে, আজ তিন-চারদিন জ্বর ছিল না ত!

বিপিন মনে মনে স্ত্রীকে অতিশয় ভালবাসিতেন। কত যে বাসিতেন, তাহা বছর চার-পাঁচ পূর্বে দাদাদের সহিত পৃথক হইবার সময় জানা গিয়াছিল। ব্যাকুল হইয়া ঘরে ঢুকিয়াই দেখিলেন, তখনও তিনি মাটির উপর পড়িয়া আছেন। ব্যস্ত হইয়া শয্যায় তুলিবার জন্য গায়ে হাত দিতেই হেমাঙ্গিনী চোখ মেলিয়া, একমুহূর্ত স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া, অকস্মাৎ দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—কেষ্টকে আশ্রয় দাও, নইলে, এ জ্বর আমার সারবে না। মা দুর্গা আমাকে কিছুতে মাপ করবেন না।

বিপিন পা ছাড়াইয়া লইয়া, কাছে বসিয়া স্ত্রীর মাথায় হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, দেবে?

বিপিন সজল চক্ষু হাত দিয়া মুছিয়া বলিলেন, তুমি যা চাও তাই হবে, তুমি ভাল হয়ে ওঠ।

হেমাঙ্গিনী আর কিছু বলিলেন না, বিছানায় উঠিয়া শুইয়া পড়িলেন।

জ্বর রাত্রেই ছাড়িয়া গেল, পরদিন সকালে উঠিয়া বিপিন ইহা লক্ষ্য করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। হাত-মুখ ধুইয়া কিছু জলযোগ করিয়া দোকানে বাহির হইতেছিলেন, হেমাঙ্গিনী আসিয়া বলিলেন, মার খেয়ে কেষ্টার ভারী জ্বর হয়েচে, তাকে আমি আমার কাছে নিয়ে আসচি।

বিপিন মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তাকে এ-বাড়িতে আনবার দরকার কি? যেখানে আছে সেখানেই থাক না।

হেমাঙ্গিনী ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া বলিলেন, কাল রাত্রে যে তুমি কথা দিলে, তাকে আশ্রয় দেবে।

বিপিন অবজ্ঞাভরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ—সে কে যে, তাকে ঘরে এনে পুষতে হবে! তুমি যেমন!

কাল রাত্রে স্ত্রীকে অত্যন্ত অসুস্থ দেখিয়া যাহা স্বীকার করিয়াছিলেন, আজ সকালে তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া তাহাই তুচ্ছ করিয়া দিলেন। ছাতাটা বগলে চাপিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, পাগলামি ক'র না,—দাদারা ভারী চটে যাবেন।

হেমাঙ্গিনী শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, দাদারা চটে গিয়ে কি তাকে খুন করে ফেলতে পারেন, না, আমি নিয়ে এলে সংসারে কেউ তাকে আটকে রাখতে পারে? আমার দুটি সন্তান ছিল, কাল থেকে তিনটে হয়েছে। আমি

কেষ্টর মা।

আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে, বলিয়া বিপিন চলিয়া যাইতেছিল, হেমাঙ্গিনী সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, এ-বাড়িতে তাকে আনতে দেবে না ?

সর, সর,—কি পাগলামি কর ? বলিয়া বিপিন চোখ রাঙ্গাইয়া চলিয়া গেলেন।

হেমাঙ্গিনী ডাকিলেন, শিবু, একটা গরুর গাড়ি ডেকে আন, আমি বাপের বাড়ি যাব।

বিপিন শুনিতে পাইয়া মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, ইস ! ভয় দেখানো হচ্চে। তার পর দোকানে চলিয়া গেলেন।

কেষ্ট চণ্ডীমণ্ডপের একধারে ছেঁড়া মাদুরের উপর জ্বরে, গায়ের ব্যথায় এবং বোধ করি বুকের ব্যথায় আচ্ছন্নের মত পড়িয়া ছিল। হেমাঙ্গিনী ডাকিলেন, কেষ্ট।

কেষ্ট যেন প্রস্তুত হইয়া ছিল—এইবারে তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, মেজদি ! পরক্ষণে সলজ্জ হাসিতে তাহার সমস্ত মুখ ভরিয়া গেল। যেন তাহার কোন অসুখ-বিসুখ নাই, এই ভাবে মহা-উৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, কোঁচা দিয়া ছেঁড়া মাদুর ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, ব'স।

হেমাঙ্গিনী তাহার হাত ধরিয়া বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিলেন, আর ত বসব ন দাদা, আয় আমার সঙ্গে। আমাকে বাপের বাড়ি আজ তোকে পৌঁছে দিতে হবে যে।

চল, বলিয়া কেষ্ট তাহার ভাঙ্গা ছড়িটা বগলে চাপিয়া লইল এবং ছেঁড়া গামছাখানা কাঁধে ফেলিল।

নিজেদের বাড়ির সদরে গোযান দাঁড়াইয়াছিল, হেমাঙ্গিনী কেষ্টকে লইয়া চড়িয়া বসিলেন। গাড়ি যখন গ্রাম ছাড়াইয়া গিয়াছে, তখন পশ্চাতে ডাকাডাকি চীৎকারে গাড়োয়ান গাড়ি থামাইল। ঘর্মাক্ত কলেবরে আরক্ত মুখে বিপিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; সভয়ে প্রশ্ন করিলেন, কোথায় যাও মেজবৌ ?

হেমাঙ্গিনী কেষ্টকে দেখাইয়া বলিলেন, এদের গ্রামে।

কখন ফিরবে ?

হেমাঙ্গিনী গম্ভীর দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল, ভগবান যখন ফেরাবেন, তখনই ফিরব।

তার মানে ?

হেমাঙ্গিনী পুনরায় কেষ্টকে দেখাইয়া বলিল, কখনও যদি কোথাও এর আশ্রয় জোটে, তবেই ত একা ফিরে আসতে পারব, না হয়, একে নিয়েই থাকতে হবে।

বিপিনের মনে পড়িল, সেদিনেও স্ত্রীর এমনি মুখের ভাব দেখিয়াছিলেন এবং এমনি কণ্ঠস্বরই শুনিয়াছিলেন, যেদিন মতি কামারের নিঃসহায় ভাগিনেয়ের বাগানখানি বাঁচাইবার জন্য তিনি একাকী সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। মনে পড়িল, এ মেজবৌ সে নয়, যাহাকে চোখ রাঙ্গাইয়া টলান যায়।

বিপিন নম্রস্বরে বলিলেন, মাপ কর মেজবৌ, বাড়ি চল।

হেমাঙ্গিনী হাতজোড় করিয়া বলিলেন, আমাকে তুমি মাপ কর—কাজ না সেরে আমি কোনমতেই বাড়ি ফিরতে পারব না।

বিপিন আর একমুহূর্ত স্ত্রীর শান্ত দৃঢ় মুখের পানে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর সহসা সুমুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কেষ্টর ডান-হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, কেষ্ট তোর মেজদিকে তুই বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আয় ভাই ? শপথ করচি, আমি বেঁচে থাকতে তোদের দুই ভাই-বোনকে আজ থেকে কেউ পৃথক করতে পারবে না। আয় ভাই, তোর মেজদিকে নিয়ে আয়।

হরিচরণ

সে আজ অনেকদিনের কথা। প্রায় দশ-বারো বৎসরের কথা। তখন দুর্গাদাসবাবু উকিল হন নাই। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুমি বোধ হয় ভাল চেনো না, আমি বেশ চিনি। এসো, তাঁহাকে আজ পরিচিত করিয়া দিই।

ছেলেবেলায় কোথা হইতে এক অনাথ পিতৃমাতৃহীন কায়স্থ বালক রামদাসবাবুর বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সকলেই বলিত, ছেলেটি বড় ভাল। বেশ সুন্দর বুদ্ধিমান চাকর, দুর্গাদাসবাবুর পিতার বড় স্নেহের ভৃত্য।

সব কাজকর্মই সে নিজে টানিয়া লয়। গরুর জাব দেওয়া হইতে বাবুকে তেল মাখান পর্যন্ত সমস্তই সে নিজে করিতে চাহে। সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে বড় ভালবাসে।

ছেলেটির নাম হরিচরণ। গৃহিণী প্রায়ই হরিচরণের কাজকর্মে বিস্মিত হইতেন। মধ্যে মধ্যে তিরস্কারও করিতেন, বলিতেন, হরি—অন্য অন্য চাকর আছে ; তুই ছেলেমানুষ, এত খাটিস কেন ? হরির দোষের মধ্যে ছিল সে বড় হাসিতে ভালবাসিত। হাসিয়া উত্তর করিত, মা, আমরা গরীব লোক, চিরকাল খাটতেই হবে, আর বসে থেকেই বা কি হবে ?

আর সহ্য হইল না। ভয়ানক জোরে হরির চুল ধরিয়া টানিয়া তাহাকে বসাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হরি ঢলিয়া বিছানার উপর পুনর্বার শুইয়া পড়িল। তখন বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্গাদাসবাবু হিতাহিত বিস্মৃত হইলেন। হরির পিঠে সবুট পদাঘাত করিলেন। সে ভীম প্রহারে চৈতন্যলাভ করিয়া উঠিয়া বসিল। দুর্গাদাসবাবু বলিলেন, কচি খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে, বিছানাটা কি আমি করিব ? কথায় কথায় রাগ আরও বাড়িয়া গেল ; হাতের বেতের লাঠি আবার হরিচরণের পৃষ্ঠে বার দুই-তিন পড়িয়া গেল।

হরি রাত্রে যখন পদসেবা করিতেছিল, তখন এক ফোঁটা গরম জল বোধ হয় দুর্গাদাসবাবুর পায়ের উপর পড়িয়াছিল।

সমস্ত রাত্রি দুর্গাদাসবাবুর নিদ্রা হয় নাই। এক ফোঁটা জল বড়ই গরম বোধ হইয়াছিল। দুর্গাদাসবাবু হরিচরণকে বড়ই ভালবাসিতেন। তাহার নম্রতার জন্য সে দুর্গাদাসবাবুর কেন, সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিল। বিশেষ এই মাস-খানেকের ঘনিষ্ঠতায় সে আরও প্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

রাত্রে কতবার দুর্গাদাসবাবুর মনে হইল যে, একবার দেখিয়া আসেন, কত লাগিয়াছে, কত ফুলিয়াছে। কিন্তু সে যে চাকর, তা ত ভাল দেখায় না ! কতবার মনে হইল, একবার জিজ্ঞাসা করিয়া আসেন, জ্বরটা কমিয়াছে কি না ! কিন্তু তাহাতে যে লজ্জা বোধ হয় ! সকালবেলায় হরিচরণ মুখ ধুইবার জল আনিয়া দিল, তামাক সাজিয়া দিল। দুর্গাদাসবাবু তখনও যদি বলিতেন, আহা ! সে ত বালক মাত্র, তখনও ত তাহার ত্রয়োদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া যায় নাই। বালক বলিয়াও যদি একবার কাছে টানিয়া লইয়া দেখিতেন, তোমার বেতের অপঘাতে কিরূপ রক্ত জমিয়া আছে, তোমার জুতোর কাঠিতে কিরূপ ফুলিয়া উঠিয়াছে। বালককে আর লজ্জা কি ?

বেলা নয়টার সময় কোথা হইতে একখানা টেলিগ্রাম আসিল। তারের সংবাদে দুর্গাদাসবাবুর মনটা কেমন বিচলিত হইয়া উঠিল। খুলিয়া দেখিলেন, স্ত্রীর বড় পীড়া। ধড়াস করিয়া বুকখানা এক হাত বসিয়া গেল। সেইদিনই তাঁহাকে কলকাতায় চলিয়া আসিতে হইল। গাড়িতে উঠিয়া ভাবিলেন, ভগবান ! বুঝি-বা প্রায়শ্চিত্ত হয়।

প্রায় মাস-খানেক হইয়া গিয়াছে। দুর্গাদাসবাবুর মুখখানি আজ বড় প্রফুল্ল, তাঁহার স্ত্রী এ যাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছেন, অদ্য পথ্য পাইয়াছেন।

বাড়ি হইতে আজ একখানা পত্র আসিয়াছে। পত্রখানি দুর্গাদাসবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতার লিখিত। তলায় একস্থানে 'পুনশ্চ' বলিয়া লিখিত রহিয়াছে—বড় দুঃখের কথা, কাল সকালবেলা দশ দিনের জ্বরবিকারে আমাদের হরিচরণ মরিয়া গিয়াছে। মরিবার আগে সে অনেকবার আপনাকে দেখিতে চাহিয়াছিল।

আহা ! মাতৃ-পিতৃহীন অনাথ !

ধীরে ধীরে দুর্গাদাসবাবু পত্রখানা শতকুটি করিয়া ফেলিয়া দিলেন।

প্রকাশক :
রবীন বল
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা ৯

দাম : ৬ টাকা

মুদ্রাকর :
ক্যালকাটা আর্ট ষ্টুডিও প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-১২